রোম থেকে রমনা

দেবেশ দাশ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই পৌষ, ১৩৬১

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
চৈত্র, ১৩৬২

দু টাকা
বার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর সৈয়দ মুজতবা আলীকে

—বহু সন্ধ্যার প্রীতি ও রস বিদগ্ধ

আলাপের স্মরণে—

এই বইয়ের কথা

রচনাধর্মে রচনাভঙ্গিতে বীরবলের চার ইয়ারী রচনাশৈলীর সমধর্মী এই বইয়ে রোম থেকে রমনা পর্যন্ত তরুণ খুঁজছে তরুণীকে, তরুণী খুঁজছে তরুণকে, পেয়ে হারাচ্ছে ; দুঃখ বেদনা ফুল হয়ে ফুটছে—অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে এই বই সম্বন্ধে বললেন তারাশঙ্কর। সেই ফুলে ফুলে ভরা জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা সন্ধানী লেখক পেয়েছেন তার বিশ্বপথিক সাহিত্যমানসে। শুধু ঘটনা সৃষ্টি বা হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতে নয়, বৃহত্তর বাঙ্গালী চরিত্রের বন্দনায় এই গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ (যুগান্তর) এবং চিত্রাঙ্কনী শক্তিতে সার্থক (প্রবাসী)। শুধু নামকরণের বৈচিত্র্যেই নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্বে ও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণে সমুজ্জ্বল (মাসিক বসুমতী) এই গল্পগুলিতে প্রেম বিবাহ রোমান্টিক দৃষ্টি ও বাস্তবজীবন সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য আছে তা আজকার যে কোন লেখকের লেখনীকে গৌরবান্বিত করতে পারত (কথা সাহিত্যে শ্রীপ্রমথ বিশী)।

বিশ্ব জুড়ে জীবনসুধার তলানীটুকু পর্যন্ত চেখে দেখেছে এই বইয়ের নায়ক নায়িকারা ; কিন্তু এই দেশেরই মাটিতে তাদের নাড়ীর টান (অমৃতবাজার পত্রিকা)। একটা নতুন স্বাদ, একটা নতুন দিগন্ত তারা এনে দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। পৃথিবীকে তারা মেলে ধরল আমাদেরই ঘরের দুয়ারে (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।

তাই সেই বিশ্বও—যাকে লেখক মুখোমুখি দেখেছেন (কল্কি, সর্বাধিক প্রচারিত তামিল সাহিত্য-পত্রিকা)—আদর করেছে 'রোম থেকে রমনা'কে। সুদূর মাদ্রাজে বইটির তামিল অনুবাদের ভূমিকায় তামিল সাহিত্যিক সংঘের সভাপতি শ্রীদেবন্ শ্রীরাজাগোপালাচারীর

হয়ে লিখলেন যে এই গল্পগুলি পড়ে আমরা উল্লসিত হয়েছি, নিঃসন্দেহ প্রমাণ পেয়েছি যে ভারতীয় ছোট গল্প পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সমান স্তরে উঠে গেছে। সিংহলী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এই গল্পগুলি ; হয়েছে ইংরেজীতে। বর্মী ভাষাতেও অনুবাদ হচ্ছে। আর হিন্দীতে আত্মপ্রকাশ করল মস্কো থেকে মাড়বার নামে।

স্বপ্নে গড়া ঘর	...	১
সোনার সন্ধ্যা	...	২৪
সন্ধ্যার মেঘ	...	৪১
নিশাস্বপ্ন	...	৫৭
যাবার বেলায় পিছু ডাকে	...	৭৩
বসন্তসেনা	...	৯৩
বিদেশিনী	...	১১৮
পাপের অধিকার	...	১৪৮
ভাসিয়ে দিলাম মালা	...	১৬৭

স্বপ্নে গড়া ঘর

হাত দেখা আমার পেশা নয়, নেশা ত নয়ই।

তবু একবার গনৎকার হতে হয়েছিল। অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়। উপরোধে লোকে ঢেঁকিও গেলে। আর আমি একটুখানি হাত ধরতে পারব না?

তবে চুরি বিদ্যের মত আমার সে বিদ্যা ধরা পড়ার আগেই যে মানে মানে সটকে পড়তে পেরেছিলাম এই রক্ষে। যখন প্রায় ধরা পড়ার যোগাড় হয়ে এসেছে তখন আমার বদলে ধরা পড়ে গেল এক বেদের জীবনের অলিখিত ইতিহাস। হস্তলিপি নাকি বিধিলিপিকে রেখাতে এঁকে রাখে। সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে যদি ভগবানকে পেতাম তাঁকে নিয়ে রুডির হাতের লেখাগুলো বদলিয়ে নেবার একটা চেষ্টা নিশ্চয়ই করতাম।

সেই রুডির রক্তরাঙা মনের গোপন একটা ঘটনাই আজ লিখতে হচ্ছে নিজের হাতে। এই হাতে খেলার ছলে তার হাতের তালু ধরে শুক্রের ক্ষেত্র, চন্দ্রের ক্ষেত্র এহেন পিলে-চমকান কত কথাই না মিথ্যে গোঁজামিল দিয়ে শুনিয়েছিলাম সেদিন। হায়, মিথ্যার বেসাতি করতে করতে কেন হৃদয়ের সত্যকে ঘাঁটাতে গেলাম?

আমি তখন হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট্ট দ্বীপে। আপনারা কেউ সেখানে যান নি। কোন ভারতীয় সেখানে সুখে থাকতে ভূতে কিলোবার জন্য যাবে না। কিন্তু আমার ভবঘুরে ভাগ্য বা নেশা এহেন পাণ্ডব-বর্জিত তেপান্তরে হামেশাই টেনে নিয়ে যায়। অচিন্ দেশে অজানা ছোট্ট ছেলেপিলেরা মজা দেখতে পিছু নিলে আমার কিন্তু রাগের বদলে ভালই লাগে।

কিন্তু ভবঘুরেমি করলেও যে ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া এড়ান যায় না তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি।

য়্যাটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ত বন্দরে পৌঁছালাম। সেখানে মেঘ আর কুয়াসার মধ্য দিয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে হেঁটে চলেছি। মনে হল যেন 'আরব্য রজনী' উপন্যাসের সেই যাত্নকরীটা বাঁশীর ডাকে আমায় হেথা টেনে এনে সব জন-মনুষ্যকেই গাছপালা বানিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

ভবঘুরে জীবনই বটে। সারাদিনে কুড়ি মাইলের উপর হেঁটে হয়রান হয়ে একটা কুটীরে আস্তানা গাড়লাম। মাত্র তিনটে ঘর। পায়ে হেঁটে পাহাড় টপকিয়ে যারা বিনি খরচায় দেশ দেখতে চায় তারা যাযাবর সমিতিতে নাম লেখায়। কেবল সেই সব অসভ্যই এই গেঁয়ো, জংলী বা পাহাড়ী কুটীরগুলিতে ঠাঁই নিতে পারে। একটা কামরায় পুরুষরা আর অন্য একটা কামরায় মেয়েরা খড়ের গাদার বিছানায় কম্বল পেতে ঘুমোতে পাবে। ভোরে সরকারী বিছানা কম্বল ঝেড়ে-ঝুড়ে রেখে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে যেতে হবে পায়ে হেঁটে দেশ দেখার জন্যে। আপনার মনে হবে যে হিন্দু শাস্ত্রটা বোধহয় ওরা কোন কোন ব্যাপারে মানে। না হলে এইসব জায়গায় তিন রাতের বেশী এক বারে থাকা মানা হবে কেন? তেসরা ঘরটাতে রান্নাঘর আর বৈঠকখানা হুয়েরই কাজ খুব হৈ-হল্লা করে চলতে থাকে।

খাওয়ার পালা নেহাতই কাটা ছাঁটা। বৈঠকটাই হল আসল। আমি এখন সেই বৈঠক জাঁকিয়ে বসেছি। একেবারে বাংলাদেশের পাড়াগেঁয়ে চণ্ডীমণ্ডপের ব্যাপার।

খাওয়ার পালা সবারই সারা হয়ে গিয়েছে। আর কিই বা খাওয়া? গোটা তিন আলু সিদ্ধ, একটা ডিম সিদ্ধ, পিঠে ঝোলান ঝুলিতে সযত্নে রাখা একটা মাখনের টিন থেকে খানিকটা মাখন নিয়ে নুন মাখিয়ে

খেয়ে নেওয়া। সারাদিন পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে অবশ্য ঠিক একাহারী থাকা যায় না। তবে একাদশীর কাছাকাছি প্রায় পৌঁছিয়ে গিয়েছি। তবু ভালই লাগে। বছরে বারো মাস ত কাঁটা-চামচে স্যুরুয়া থেকে শুরু করে পুডিং পর্যন্ত চালাই। মাস তুই না হয় একটু গেঁয়ো সাদা-মাটা জীবনই যাপন করলাম। অভাব ত মনে হচ্ছে না কিছুরই।

কেবল একটা জিনিস বাদে। এক ছিলিম তামাক একটা হুঁকোর মাথায় বসিয়ে, চোখ বুজে পা ছড়িয়ে আরামে টানতে পারা যায় না একটু? অথবা গড়গড়া? অবশ্য আমার চারদিকেই মাটিতে, খড়ের গাদায় বসে আছে 'ইয়ুথ হোস্টেল' সমিতির যাযাবর তরুণ তরুণীর দঙ্গল। তারাও এই তুর্গম দেশ দেখতে বেরিয়েছে। কিন্তু সেখানে যে ভারতীয় কাউকে দেখবে তা বোধহয় তারা ভাবতেও পারেনি। কেই বা পারবে? আজ যখন গ্রামের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলাম স্কুলটা ত আমায় দেখে ভেঙেই গেল। সব ছেলের দল ক্লাস ফেলে আমার পিছু নিলে। মাস্টাররাও তাদের যেন ডেকে ফেরাতেই আসছে এমন ভাবেই আমার পিছু নিলে। শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গল্প করতে হল খানিকক্ষণ। চা খাইয়ে তবে তারা আমায় ছাড়ল। আমি ওদের দেশ দেখতে এসেছিলাম, আর ওরা কিনা আমাকেই না-দেখে ছাড়ছে না!

কিন্তু তামাক খাওয়ায় না কেউ এক ছিলিম এখন? ভাবতে ভাবতে গোটা তিনেক সিগারেটের কাগজ থুথু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে মোটা একটা সিগারেট বানিয়ে নিলাম। তু আঙুলের মধ্যে সেটাকে এমন ভাবে মুঠি করলাম যাতে হুঁকোর খোলটা সাপটে ধরে তামাক খাবার মত দেখায়। হুঁকো টানছি মনে করতে করতে সত্যি সত্যিই হুঁকোর সোয়াদ যেন পেতে লাগলাম। আরামে মাথাটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে আর বাঁ থেকে ডাইনে তুলতে লাগল।

না, ভাববেন না যে আমার মাথায় টিকি ছিল আর ঘড়ির পেণ্ডু-লামের মত সেটা দুলছে দেখে খাস বৃটিশ তরুণ তরুণীরা আমার চারদিকে ঘিরে এসে বসেছে। বসে বসে তূরীয়ানন্দে বিভোর আমার টিকি দোলান নজর করে দেখে নিচ্ছে। যে ধোঁয়ার স্বর্গে মনে মনে উঠে গিয়েছিলাম তা থেকে একটু নেমে এসেই চোখ খুলে দেখি গুটি দশ বার তরুণ তরুণী খুব মনোযোগ দিয়ে আমায় দেখছে। চোখ মেলে আমায় হঠাৎ চাইতে দেখে তারা একটু মুশকিলে পড়ে গেল।

ছেলেবেলা থেকে আমি পূব বাংলার গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে যাত্রা-পার্টির অভিনয় দেখে এসেছি। কেমন করে এমন অবস্থায় চোখ ধীরে ধীরে মেললে, চোখের একটা ভুরু একটুখানি ওঠালে দর্শকরা 'হে গুরু, তোমায় প্রণাম করি' এমন একটা ভাবে অভিভূত হবে তা জানা আছে।

ঠিক তেমনি একটা ভঙ্গি করলাম আর ডান হাতটা বরাভয় দেবার জন্যই যেন একটু হালকা ভাবে সামনে এগিয়ে দিলাম। তারপর কতখানি 'এফেক্ট' হল তা বুঝবার জন্য আর একটা ভুরু একটু উপরের দিকে টেনে তুলে আবার দুটি চোখেই একটা প্রশান্ত ভাব ফুটিয়ে তুললাম। মনে মনে টের পেলাম খুব জবর একটি অভিনয় হল। এখনি সবাই ভক্তিভরে 'জয় বাবা ভোলানাথ' বলে সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম না করে বসে!

তার বদলে একেবারে ভয় বা ভক্তির ভাব মুছে ফেলে মুচকি হেসে একটি মেয়ে তার হাতখানি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ক্ষমা করুন, যদি কিছু মনে না করেন, একবার আমার হাতটা দেখে দিন না।'

একটু নির্দোষ 'পোজ' করতে চেয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু গনৎকার সাজবার কোন মতলব বা বিদ্যা আমার ছিল না। এখনো নেই।

গোটা কয়েক চটি বই, হাত দেখা সম্বন্ধে যা সবাই পড়ে থাকে, শুধু তাই সম্বল। এবং তাও মাত্র লোকসমাজে কথাবার্তা চালাবার জন্য, ভবিষ্যৎ দেখবার জন্য নয়। কাজেই সবিনয়ে মাপ চাইলাম।

মেয়েটি আবার অনুরোধ করল। আবার বললাম, 'বিশ্বাস করুন, আমি হাত দেখতে কিছুই জানি না।'

তরুণী অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলল, 'না, জানেন না! আমরা বুঝি আর জানি না যে, ইণ্ডিয়ানরা দৈব বিদ্যায় ওস্তাদ। হাত দেখতে আর সাপ খেলাতে প্রত্যেক ইণ্ডিয়ানই জানে।'

রাগের সঙ্গে হাসি মিশ খেয়ে গেল। বললাম, 'সেটা আপনাদের কল্পনা। আমাদের দেশে সাপুড়ে ও গনৎকার দুই-ই আছে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তা ছাড়া আমি ও দুটোর মধ্যে কোন দলেরই নই। আমি আপনাদেরই মত সাধারণ লোক। পকেটের পয়সা খরচ করে দেশে দেশে বেড়াই। তবে মার্কিন টুরিস্ট নই, আর এই রকম অজানা জায়গাতে বেড়াতে বেশী ভালবাসি। এই, এই আপনাদেরই মত—'

আমার নিবেদন মঞ্জুর হলো না। সবাই তরুণীর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমায় ঠেসে ধরল। বলল যে আমি নিশ্চয়ই হাত দেখতে জানি। স্কটল্যাণ্ড অর্থাৎ বিস্কুট খণ্ডের পোশাক 'কিল্ট' অর্থাৎ গামছাপরণী নীলনয়না এক তরুণী ঠোঁট উল্টিয়ে একটু আদর আর একটু ঘনিষ্ঠতা মিশিয়ে ডেকে বসলেন 'জর্জ'। ওদেশে ওরা অচেনা ভারতীয়ের সঙ্গে ভাঁব দেখাতে হলে 'জর্জ' বলে ডাকে।

কুমারী বিস্কুটি ঠোঁট উল্টিয়ে বললেন, 'জর্জ, এত গোঁয়ার হবেন না। বাইরে শোঁ শোঁ ঝড়ো হাওয়া বইছে, পাশের হ্রদের ঢেউগুলির জলপরীরা এতক্ষণে নাচানাচি শুরু করেছে। আর রূপকথার জীব-জন্তুরাও সব ডাকাডাকি করছে। রাত নিযুতি হয়ে এলো। দুয়েকটা

খোস খবর দিয়ে দিন না, জর্জ, ঘুমোতে যাবার আগে। একটু স্পোর্ট হোন।'

নাঃ, আমায় স্পোর্ট হতেই হবে। এত অনুরোধ, বিশেষ করে মিঠে অনুরোধ ফেলা যায় না। ওদের অবশ্য মনের কথা বুঝতে পেরেছি। শুনেও সুখ এমন কয়েকটা ভবিষ্যদ্বাণীর পর আরামে ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন যদি কেউ দেখে ত দেখুক না। মিথ্যা বলার যেটুকু পাপ হবে তা আমারি হোক। ওরা ত একটু খুশী হবে—।

ঘরের মধ্যে ঝুল বারান্দার মত একটুখানি জায়গা ছিল। একটু উঁচুতে আর রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখানে গিয়ে উঠে বসলাম। খুব ভণিতা করে হাত পা ঝেড়ে নিলাম। একটু চেঁচিয়েই 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' গোছের দুয়েকটা ভুলে-যাওয়া সংস্কৃত শ্লোক পর্যন্ত চোখ বুজে আউড়ে নিলাম। তারপর একটুখানি চোখ বুজে থেকে 'ওঁ ওঁ হ্রীং ক্রীং' প্রভৃতি উচ্চারণ করে নাকটা একটুখানি চেপে ধরে চোখ বুজে রইলাম।

তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুলে বললাম, 'মেরী বলে যে মেয়ে এই ভিড়ের মধ্যে আছ এগিয়ে এসো।'

সক্কলেই একেবারে তাক বনে গেল। কি আশ্চর্য, সত্যিই ত জর্জ যাদুবিদ্যা জানে। নিশ্চয়ই জানে। না হলে মেরী বলে যে একটি মেয়ে আছে তা সে কি করে জানতে পারল? আর সে ঠিক আজই সন্ধ্যাবেলা এ হোস্টেলে এসেছে। কাজেই তার নাম ত কারো এরি মধ্যে জানতে পারবার কথা নয়।

মেরী ত এগিয়ে এলো আহ্লাদে কৌতূহলে দুরুদুরু বুক নিয়ে। তার মুখের দিকে খুব তীক্ষ্ণ ভাবে তাকিয়ে বললাম—'প্রশ্ন করো, মোটে তিনটি প্রশ্ন—'

মেরী নিজেকে খুব বুদ্ধিমতী মনে করে। সে বলল—'আমি কি প্রশ্ন করতে চাই, বলুন প্রথমে।'

একটু চোখ বুজে রইলাম। তার দেহের গড়ন-পেটনের দিকে ভালভাবে তাকালাম। তার স্বর ও উচ্চারণ মনে মনে যাচাই করে নিলাম; তার আঙুলগুলিও দেখে নিলাম। তারপর তার হাত তুলে ধরেই বললাম,—'আপনি ভাবছেন আপনি সুখী হবেন কি না।'

বেচারী মেরী। সে কিছু ভাবতে সময় পেল না। চট্ করে বলে বসলো—'ঠিক কথা। কিন্তু বলুন, যাকে নিয়ে সুখী হব তার নাম কি?'

উত্তরটা না পেলে মেরী নিশ্চয়ই মারা পড়বে না। কিন্তু আমার যে এ বড় ফ্যাসাদ হল। আবার চোখ বোজার শরণ নিতে হল। সে অবসরে তার হাতব্যাগটির দিকেও একবার ভাল করে উঁকি মেরে নিলাম। কই, কিছুই নজরে পড়ল না। মরিয়া হয়ে বলে দিলাম, 'বব, জর্জ, জন—এই তিনজনের মধ্যে একজন।'

আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেল মেরী। বলল, 'ওঃ, আপনি একেবারে যাতুকর। রবার্ট এস. জনের নামডাক বহু লোকে জানে, কিন্তু আমার মাও তাকে জানে না এখনো। আচ্ছা, আচ্ছা, শেষ প্রশ্নের উত্তর দিন। সে কি আমায় ভালবাসতে আরম্ভ করেনি?'

রবার্ট এস. জন নামটা মনে মনে যাচাই করে নিলাম। ইংরেজরা রবার্টকে আদর করে ছেঁটে নিয়ে বব বলে ডাকে। ভাবলাম—চালিয়াৎ ছোকরা; না হলে আর এমনভাবে নামটা সাজিয়েছে? বলতে একটুও দ্বিধা হল না যে—'তুমি কক্নী বলে সে এখনো একটু দোমনা দশায় আছে। কিন্তু তা কেটে যাবে; বিশেষ করে যখন দেখবে তোমার শিক্ষিত হবার চেষ্টা সফল হয়ে আসছে।'

হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে নেমে গেল মেরী। খুশীর একটা

ঢেউ খেলে যেতে লাগল তার পায়ের নাচনে। আমিও খুশী হয়ে উঠলাম তাকে খুশী করতে পেরেছি দেখে।

ভেবে দেখতে গেলে এমন শক্ত কাজ কিছু নয়। সেখানে যত জন ছেলে আর মেয়ে ছিল সবাই হাত দেখাতে ঝুলোঝুলি করছে। কিন্তু বয়স প্রায় সকলেরই বিশের কোঠায়। কাজেই সেই একই রকমের প্রশ্ন করতে লাগল। ঘুরে ফিরে মেয়েরা সেই জিজ্ঞেস করে: ভাল-বাসা পাব কিনা? সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য হবে কিনা? আর, আশ্চর্যের বিষয় পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই সুখী হবার বিষয়ে বেশী প্রশ্ন করল।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমি খুব সুখী হয়েছি। কিন্তু কি করে হলাম?'

তার নরম সুন্দর হাতের তালু তুলে ধরেই বলে দিলাম, 'স্বর্গ থেকে স্বামী নামে একটি মানুষ তোমার ঘরে নেমে এসেছে। সে তোমায় খাটতে দেয় না। বরং নিজেই খেটে মরে—এত ভাল স্বামী। ঘরকন্নার কাজও সে অনেক করে দেয়।' (ওদের দেশে স্বামীরাও যে স্ত্রীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ঘরকন্নার অনেক কাজ করে নেয়, সে খবরটা আমাদের এই পোড়া দেশের গিন্নীরা জেনে রাখুন।)

কি করে বললাম তাও ফাঁস করে দিচ্ছি এখানে, কারণ সে মেয়েরা কেউ এ গল্পটা পড়বে না জানি। ওই রকম হাতের তেলো আর আঙুল শুধু তাদেরই হতে পারে, যারা বিলেতের মত দেশেও ঘরকন্নার কাজ করে না। আর সে যে আমায় ঠকাবার জন্য বিয়ের আংটিটি খুলে রেখেছিল, সেও ত হাত ধরেই বুঝতে পেরেছিলাম।

ছেলেরা প্রশ্ন করল নিজেদের কাজের সম্বন্ধে। প্রায় সবাইকেই বললাম, 'বিদেশে গেলেই বেশী উন্নতি হবে।' যারা "এমপায়ার" সাম্রাজ্য গড়েছে তাদের জাতের ছেলেদের সে কথা বলা খুবই সহজ। কেউ প্রশ্ন করল—তার প্রেমে কেউ পড়েছে কিনা। উত্তর খুবই

সহজ—তুমি জান আর না জান, তোমার প্রেমে কোন-না-কোন মেয়ে নির্ঘাত পড়েছে। এমন কি কয়েকজনকে একথাও বললাম যে, একজনের চেয়ে বেশী মেয়েই প্রেমে পড়েছে। নিশ্চয় করে জানতাম যে, উত্তরটা ঠিক না হলেও কোন ছোকরার এমন বুকের পাটা নেই এমন একটা সুখের কথা লোকের সামনে অস্বীকার করতে পারবে।

মোট কথা এই ভাবেই আমার হাত দেখার বিদ্যা ওই অন্ধকার রাতে বড় বিদ্যার মতই প্রেমসে চালাচ্ছিলাম। কিন্তু কে জানত যে আমার নামডাক এত তাড়াতাড়ি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাইরের লোককেও ডেকে আনবে। আমার হাত দেখার খেলা খুব ওস্তাদি দেখিয়ে প্রায় শেষ করে এনেছি এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটি অদ্ভুত দেখতে লোক ঘরের মধ্যে হামবড়া ভাবে ঢুকে এল। কে একজন ফিসফিস করে বলে উঠল, 'ওঃ, সেই রোমানিটা? ওর ক্যারাভ্যান আজই এ গ্রামে ঢুকেছে। জ্বালাবে দেখছি!'

রোমানি (বেদে) বড় বড় পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। বেশ গাট্টাগোট্টা লোক ; ইংরেজদের মত ফরসা নয়। ইয়া পাকানো গোঁফ ; উড়ন্ত প্রজাপতির ধাঁচে ঠোঁটের উপর থেকে সামনে পাখা মেলে এগিয়ে আসছে। কানে ছেঁদা করে বসান আংটি আর মাথায় লক্কা পায়রা ধরনের ফেট্টি বাঁধা। গলায় টাইএর বদলে রেশমী রুমাল আর শার্টের উপর ভেলভেটের ওয়েস্টকোট। চিনতে একটুও ভুল হয় না যে, এ হচ্ছে একটি ইউরোপীয় জাত-বেদে। নানা বিদ্যায় ওস্তাদ। আমাদের দেশের মূর্খ, অসভ্য বেদে নয়।

একটু হয়রান হয়ে এসেছিলাম। বাঙালী হাড়ে আর কত সইবে? রাতও প্রায় দশটা হয়ে এল। সবারই ঘুম পেয়েছে।

আমার অবস্থা আরো খারাপ। কেবল দেশের নাম রাখবার জন্যই এই দুঃসাহসী রণে ভঙ্গ না দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি এখনো।

সে এসে বলল, 'স্যার, গ্রামে আপনার অলৌকিক বিদ্যা সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। সবাই বলছে যে ফিংগালের পর এমন জ্যোতিষী আর য়্যাটল্যান্টিক সাগরের এপারে কখনো আসেনি। আপনি যদি দয়া করে আমার হাতটা একবার দেখে দেন।'

সহজে ভুলবার মত ভবী আমি নই। হাতদেখার বিদ্যায় বেদেরা সাধারণতঃ ওস্তাদই হয়। যে সুনাম এতক্ষণ ধরে তৈরী করেছি আর বজায় রেখেছি, তা নস্যাৎ হতে দেবার পাত্র নই আমি।

বললাম, 'মানুষের কাজ করবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। আমার চোখ আর মন দুই-ই ক্লান্ত। আজ রাতটার মত ক্ষমা দাও।'

মনে মনে অবশ্য জানি যে কাল ভোরবেলা সামনের পাহাড়ে সূয্যিমামা, আর এই কীর্তিমান একসঙ্গেই উদয় হবে। পাখী ডাকার আগেই পথ আমায় ডাক দেবে। কোথায় থাকবে এই বেদে আর আমার বিদ্যার পরীক্ষা!

সেও ছাড়বার পাত্র নয়। সে দৃঢ়স্বরে অথচ অনুনয় করে বলল, 'দয়া করে দেখুন একবার। মাত্র একটি প্রশ্ন। মাত্র একটি।'

ঘুমভরা চোখে সবাই তার হয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগল: 'জর্জ, মাত্র একটি প্রশ্ন! ও বেচারা যখন এসেছে এতদূরে—আর তোমার মত লোক কোথায় আছে! বী এ স্পোর্ট—'

কি করি! অদৃষ্ট পাঠের খেলায় শেষ পর্যন্ত আমার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। অগত্যা খেলোয়াড় হতেই হলো।

রোমানি যেন গম্ভীরভাবে গর্জন করে উঠল, 'আমার বিয়ে হল না কেন?' বলেই এমনভাবে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল যেন ঠিক উত্তর

দিতে না পারলে হাতের পাঁচটি আঙুল ক্যাঁক করে আমার পেটের ভিতর সেঁধিয়ে নাড়ীভুঁড়ি সব ছিঁড়ে বের করে আনবে।

অগত্যা, কিয়েরোর ভুলে-যাওয়া বইগুলির শরণ নিতে হল। তাও দেখি যে, ও বিদ্যায় কুলোয় না। সবচেয়ে মুশকিল হল এই ভেবে যে এরা বোধহয় ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, বেদে আর ভারতীয় দুজনাই এ বিদ্যায় ওস্তাদ। অতএব জর্জকে নিশ্চয়ই রোমানি ঠকাতে পারবে না।

এতগুলি কৌতূহলী চোখের সামনে হাতের রেখা ঠিকমত পড়তে পারাও শক্ত। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে ভাগ্যের ক্ষেত্রে যাবার রেখাটা কেটে গেছে এবং তার উপর মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে একটা রেখা এসে সেটার সঙ্গে কাটাকাটি করেছে। কিন্তু কি থেকে কি ধরতে হবে তার ঠিক নেই।

হায়, গুরুদেব কিয়েরো! জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে রোমানির হাতের রেখাগুলি ভাল করে ফুটিয়ে দাও, যাতে ঠিকমত যা-হোক কিছু একটা বলতে পারি।

হঠাৎ বলে উঠলাম, 'তোমার বিয়ে হলে রক্তপাত হত, তাই হল না।'

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হল। সূক্ষ্ম স্নায়ু-ওলা বিলিতী মেয়েদের প্রায় মূর্ছা যাবার যোগাড় হল। 'ওঃ মাই', 'ওঃ গুডনেস' প্রভৃতি ভয়ভরা কথা তাদের পাতলা ঠোঁট থেকে বেরোতে লাগল আর দ্রুত নিঃশ্বাসে বুকগুলি অনিশ্চিত ভাবে দুলে উঠলো। একটি ছিপছিপে চেকনাই মার্কা তরুণ বলে উঠল, 'মাই হ্যাট!'

রোমানি কিন্তু আমার হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল। ঠোঁট চেপে সে নিজের উত্তেজনা সামলিয়ে বলল, 'তুমি কি করে জানলে, জর্জ?'

বুঝলাম যে, একটা দারুণ ওস্তাদের মার মেরেছি। খুশী মনে

প্রায় শিষ দিয়ে উঠলাম। কোনমতে সেটা থামিয়ে বললাম, 'তোমার মোটে একটি প্রশ্ন করবার কথা।'

সবাই সায় দিল এবং গুড-নাইটের পালাও আরম্ভ হয়ে গেল। অনেকে তাড়াতাড়ি আমায় প্রচুর ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে শোবার ঘরে সরে পড়ল। মেরী যাবার সময় কানে ফিসফিস করে বলে গেল যে, শীগ্‌গিরই আমায় তাদের যুগলের ছবি পাঠাবে এবং তাদের বিয়েতে যেন নিশ্চয়ই হাজির হই।

রোমানি কিন্তু অত সহজে ছাড়ল না। সে বলল, 'জর্জ দয়া কর, আমায় দশটা মিনিট দাও।' তার চোখে দেখলাম অনন্ত দুঃখের ছায়া। বিশাল দেহ তার যেন অসহায় ভাবে ভেঙে পড়ছে। বড় মায়া হল। এই ছোট্ট ঘরটির মধ্যে একটি লোক, যাকে ঠকাতে ইচ্ছা হয়নি। এই একটি লোক যার বাইরের রুক্ষ ঢাকনার তলায় কোথায় একটা দুঃখী অন্তর আছে। তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে আমাদের দু'জনেরই মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল। হ্রদের জলে চাঁদের হাসি লুটোপুটি খেয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে গড়িয়ে যাচ্ছে। চারদিক নীরব। আমরা দু'জনে দুটো পাথরের উপর বসলাম।

সে বলল, 'জর্জ, তুমি ঠিকই বলেছ আমাদের বিয়ে হলে রক্তপাত হত। কিন্তু কেন হত, তা তোমায় আর জিজ্ঞেস করতে চাই না।'

ওই বিশাল ও রুক্ষ মানুষটার কণ্ঠস্বর একেবারে যেন ভেজা। ফিসফিস করে বললাম, 'আমি শুনতে চাই না তোমার ব্যথার কাহিনী।'

'ব্যথার কাহিনী? কি করে জানলে যে তা ব্যথায় ভরা? তুমি ছেলেমানুষ, তুমি ব্যথার কি জান?' এমন কোমল ভাবে সে জিজ্ঞেস করল যেন তার মধ্যে কোন প্রশ্ন নেই।

বললাম, 'আমি স্রোতের ফুলের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যেতে চাই। ব্যথার কিছু যদি না-জানতে হয়, তার চেয়ে সুখের আর কি আছে?'

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তা ত হবে না। তুমিও একদিন দুঃখ পাবে। দুঃখ পেতেই আমাদের জন্ম। বিশেষ করে বিদেশে এসেছ—যদি কোন বিদেশিনীকে ভালবাস!'

হেসে বললাম, 'আর যদি নিজের দেশের কাউকে ভালবাসি?'

'তবুও দুঃখ পাবে। ভালবাসলেই দুঃখ পাবে। কারণ স্বদেশিনীও ভালবাসার ছোঁয়া পেলেই বিদেশিনী হয়ে ওঠে। হাতের কাছে বা মুঠার মধ্যে সে আর থাকে না।'

ভালবাসার অত কিছু বুঝি না আমি। প্রশ্ন করলাম, 'যাকে ভালবাসব তাকেও ভালবাসার মধ্যে দিয়েই কাছে পাব।'

সে বলল, 'না, তা পাবে না। ভালবাসা কাছের মানুষকে দূরের করে দেয়। অথবা বলতে পার যে, যাকে সুদূর মনে কর তাকেই তুমি ভালবাস।'

আমি॥ তোমার কথাগুলি খুব 'সফিস্‌টিকেটেড' দর্শনতত্ত্বের মত শোনাচ্ছে।

সে॥ তুমি বোধহয় ভাবছ যে, একটা বেদে কি করে এসব কথা ভাবে। আমরা স্ত্রী-পুরুষ বিয়ের পর কখনো স্বামী বা স্ত্রীকে ঠকাই না। এক সঙ্গে এক মন নিয়ে সংসারে চলি। আমার মাথায় এসব তথ্য আসার কথা নয়। কিন্তু জান, আমিও ইংরেজী বই পড়েছি অনেক। অবশ্য না পড়লেই ভাল হত।

আমি॥ কেন? তোমরা ত এমনিতেই খুব গরম লোক বলে জানি। ইংরেজী তোমাদের আর নূতন কি শেখাবে প্রেম সম্বন্ধে?

সে॥ ওটা তোমাদের ভুল। তুমিও বোধ হয় লেডি ইভিয়ান স্মিথের বই পড়ে ধরে নিয়েছ যে, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় গরম রক্তের রোমানি মেয়ে 'জর্জিয়ো'দের সঙ্গে রোমান্স করে বেড়ায়। বরং তার ঠিক উল্টো। যাক্ না কোন জর্জিয়ো (সভ্য জাতের লোক) কোন রোমানির সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে। একটা 'কাশে'র অর্থাৎ চেলা কাঠের ঘায়ে রোমান্সের ভূত ভাগিয়ে ছেড়ে দেবে।

আমি॥ তবে? তোমার ত দুঃখের কোন কারণ থাকার কথা নয়।

সে॥ সেখানেই ত হল মুশকিল। আমরা রোমানিরা বিয়ে করি, তোমাদের মত ভালবাসি না। আমি গিয়েছিলাম ভালবাসতে।

আমি॥ তারপর বুঝি দেখলে যে, ভালবেসে তাকে সুদূর করে দিয়েছ?

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বলল, 'না, তা নয়, ভালবেসেছিলাম —সে সুদূর বলে। সে ছিল এক জর্জিয়া মেয়ে,—বিদেশিনী।'

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

একটু পরে সে বলল, 'সে ছিল তোমাদের সভ্য জগতের মেয়ে। দিনে রাতে নিমেষে নিমেষে সে নতুন। নিত্য তাকে পাবার সাধনা করতে হবে। একটি চুমিদাভে (বেদেদের বিয়ের মন্ত্রপূত চুমুতে) তাকে বাঁধা যায় না।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তাই তাকে পেলাম না।

ওই পাহাড় প্রমাণ রুক্ষ চেহারার কিন্তু সরল মনের লোকটির এই নিজেকে খুলে ধরার কাহিনী শুনতে কষ্ট হচ্ছিল। অথচ শুনতেও কৌতূহল ছিল খুব। কিন্তু সে নীরব হয়ে রইল। স্মৃতির সাগরে সে ডুব দিয়েছে। তাকে তুলে আনা হয়ত সহজ হবে না। আর সে যদি নিজে থেকে আর না বলতে চায়, খুঁচিয়ে কথা বের করতেও

মন চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত শুধোলাম, 'তুমি যে বলেছিলে বিয়ে হলে রক্তপাত হত—সে কথাটা ত আমাকে বোঝালে না?'

যেন ঘুম থেকে উঠে এল সে। ধীরে ধীরে আরম্ভ হল তার কাহিনী।

আমাদের বিয়ে হল দিনের বেলা। প্রথমে গণ্ডি দিয়ে দাঁড়ায় বাচ্চারা। তাদের পেছনে ছেলে-মেয়ের দল। বয়স্করা সবার শেষের সারিতে। গণ্ডির ম্াঝখানে বর-কনে তাদের পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। বরের বাঁ হাতের আর কনের ডান হাতের চাটুতে ফুটো করে রক্ত বের করে দেওয়া হয়। ছজনের হাতে হাত রাখলে সেই রক্ত পরস্পারের শরীরে মিশে যায়, আর সাতটি কুমারী রেশমী স্যুতো দিয়ে শক্ত করে হাত ছুটি বেঁধে দেয়। তারপর বর-কনে পরস্পরকে চুমু দেয়। তার মানে হচ্ছে যে, তুমি চিরকালের জন্য আমার, আর আমি চিরকালের জন্য তোমার।

'বাঃ, কি রোমান্টিক বিয়ের প্রথা তোমাদের—' বললাম আমি।

কিন্তু সে খুশী হল না; বলল, 'জান, এই রক্তমাখা প্রথাটার জন্যই আমার বিয়ে হল না। রক্তাক্ত হৃদয়ে আমায় ঘর ছাড়া হয়ে চলে যেতে হল। না হল আমার রোমেরিন (বিয়ে), না পেলাম আমি রোভেল (বধূ)।'

চুপ করে রইলাম আমি। সে বোধহয় আকাশকেই উদ্দেশ করে অন্যমনে বলল, 'অথচ কি রকম রিকেনি (সুন্দর) বোরো ডিব্বাস (উৎসবের দিবস) হয়ে উঠত, বেটি যদি আমার 'ভার্ডো'তে (ক্যারাভ্যানে) আসতে পারত?

খুব নীচু স্বরে যেন নিজেকেই আমি প্রশ্ন করলাম, 'কেন পারল না সে? সে কি ভালবাসত না তোমায়?

সে॥ হ্যাঁ ভালবাসত, খুবই ভালবাসত। এত ভালবাসত যে, সে তার বিদ্যুতের আলো আর গ্যাসের উনুন ছেড়ে কেরোসিনের কুপীর আলোয় চেলা কাঠের আগুনে রান্না করবার জন্য আমার 'ভার্ডো'তে উঠে আসতে রাজী ছিল।

আমি॥ তবে?

সে॥ সেখানেই ত মুশকিল। তাকে প্রথম দেখলাম জঙ্গলে রাস্‌প্‌বেরী পাড়তে-পাড়তে। সে-ও এসেছিল একই কাজে। জ্যাম তৈরি করবে বলে। আমি তাকে নতুন একরকম জ্যাম তৈরি করবার কায়দা শিখিয়ে দেব বলাতে সে আমার আস্তানায় এল। আমিও আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে তাকে জ্যাম করা শেখাতে এত ভাল লাগে! নতুন নতুন পাকপ্রণালী ভবিষ্যতে শিখিয়ে দেব, এ আশ্বাস তখনি দিয়ে দিলাম। কিন্তু কেন দিলাম? নিজের মনেই যেন সে বলে উঠল, 'কিন্তু কেন দিলাম—?'

'বিদেশিনী বলে?' খুব নরম সুরে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যেন ঘুম থেকে জেগে চমকে উঠে সে বলল, 'না, তা নয়। সব জর্জিয়ো মেয়েই ত আমাদের চোখে বিদেশিনী। নতুন একটা গ্রামের গলিপথ দিয়ে যখন আমাদের ঘোড়া-টানা ঘর-বাড়ির গাড়ি চলতে শুরু করে তার চাকাগুলি যেন সভ্য ছোকরাদের প্রাণে দাগা হানতে হানতে যায়। কিশোরী যুবতীর দল আমাদের চাকায় চড়ানো সংসারগুলি ছেঁকে ধরে। কেমন করে আমরা রাঁধি, কেমন করে দিন কাটাই, সে সব দেখবার অজুহাতে সময়ে অসময়ে আমাদের চারদিকে ঘুর ঘুর করে। কিন্তু কারো দিকেও আমরা ফিরে তাকাই না।

আমি॥ তোমাদের অজানা জীবনের দিকে তাদের যে কৌতূহল, সে ত স্বাভাবিক।

সে॥ হ্যাঁ, অজানার জন্য, অদেখার জন্য ব্যাকুলতা স্বাভাবিক, কারণ তোমরা সভ্য। তোমাদের দৃষ্টি, তোমাদের গতি সবই সভ্যতার মধ্যে গণ্ডিবাঁধা।

আমি॥ আর তোমাদের?

সে॥ আমাদেরও তাই। তবে পৃথিবীময় আমরা ঘুরে বেড়াই, বাসা বাঁধি না। তাই মন বসে না কোথাও। রোমান্সের জন্য ব্যাকুল ওই তোমাদের সভ্য মেয়েদের জন্যও না। এদিকে দেখ, আমাদের আস্তানায় এসে অন্তত এক কাপ চা খাবার জন্য তাদের আগ্রহের সীমা থাকে না।

রাত্রি অনেক হয়ে যাচ্ছিল। বললাম, 'কিন্তু তোমার কি হল তাই বল।'

সে॥ আমার আর কি হবে। বেটিকে মনে হল শুধু মেয়ে নয়, মহিলা; নারী নয়, রাণী।

আমি॥ বুঝলাম—তারপর যা হবার তাই হল।

আর সহ্য করতে না পেরে সে বলল, 'না, কিছুই বোঝনি। আমরা যতদিন আইবুড়ো থাকি, এসব রঙীন খেলায় কোন আপত্তি দেখি না। এখনও দেখতাম না। বেটিকে যদি শুধু একটি মেয়ে বলে মনে হত তাহলে বেঁচে যেতাম। অতি কাছের, অতি জানা, সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে দুদিন খেলা করে তৃতীয় দিন কেটে পড়তাম আস্তানা তুলে নিয়ে।

আমি॥ অর্থাৎ তাকে ভালবাস বলে যখন আবিষ্কার করলে, তখন দেখলে যে সে সুদূর ও রহস্যময়ী হয়ে গেছে? ভালবাসা তোমাদের মধ্যে সেতু বাঁধল না, পরিচয়ের স্রোতের মধ্যে বাঁধ বেঁধে দিল?

সে॥ ঠিক তাই। তখন থেকেই মনে হল, তাকে যেন চিনি না। তার আদিও নেই, অন্তও নেই। তার চোখ-ধাঁধানো ফরসা রঙের

পেছনে কোথায় যে অন্তর লুকানো আছে তার সন্ধান দু'হাতে আতিপাঁতি করে খুঁজেও পাই না। তার নীল নয়ন দুটি নীল মহাসিন্ধুর ডাক জানিয়ে যায়। তার ঢেউ-খেলানো কোঁকড়া সোনালী চুলের উপর পর্যন্ত চুমু দিতে সংকোচ বোধ হয়। হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে এসে স্বপনের মাঝখানে সে ঠাঁই নিল।

চাঁদ তখন হ্রদের ওপারে পাহাড়ের আড়ালে প্রায় লুকিয়ে পড়েছে। দু-একটা গ্রাউজ পাখীর ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। আর পৃথিবীতে কিছু নেই।

সে বলে চলল, 'ক্রমে আমাদের আস্তানা গুটোবার সময় হয়ে এল। আমাদের সর্দার আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিস দিল। আমি তখন ফাঁসির নোটিস পেলাম মনে হল। সর্দার অবশ্য আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা কী। আমায় খোলাখুলি বলল যে, এসব চলবে না। রোমানি স্বামী তোমাদের অতি লক্ষ্মী সুসভ্য স্বামীদের মত ভোর বেলার শীতে গরম এক কাপ চা হাতে নিয়ে এসে স্ত্রীর ঘুম ভাঙাবে না। আমাদের জীবন একটা একটানা অলস চুমু খাওয়া নয়। আমাদের মেয়েরা বিয়ে করে স্বামীর সহকর্মিণী হবার জন্য। তাকে একপাল ছেলেপিলে দেবার জন্য, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত কাজের মধ্যে ডুবে থাকার জন্য। তারা হচ্ছে তোমাদের দেশের কুমড়ো গাছের লতা, বিলেতের 'মর্নিং গ্লোরি' নয়।

'মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে সর্দার জানিয়ে দিল যে —'বেটি' হচ্ছে উদ্যানলতা। প্রেম করতে পারে, কিন্তু সংসার করতে পারবে না। সে যখন বিয়ে করবে, মাথায় সাজাতে হবে বরফের মত সাদা জর্জেটের ঘোমটার ওপর কমলা ফুলের স্তবক। তার হাতের তালুর রক্তপাত করতে গেলে সে ভিরমি খাবে।'

এই পর্যন্ত বলে সে আবার স্মৃতির সায়রে ডুব দিল।

খানিক পরে সে নিজেই আবার আরম্ভ করল, 'সে কথা বোধ হয় ঠিক। 'বেটি' ছিল রোমান্টিক, যা শুধু ইংরেজ মেয়েরাই হতে পারে। ভেবে দেখ, মনে কতখানি রঙ থাকলে ওরা সাহস করে বিদেশীদের সঙ্গে ভালবাসায় পড়ে। যদিও ওরা জানে যে, বেশীর ভাগ সময় ওরা ঠকবে। মনে করে দেখ—দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ সবের বাধা এড়িয়ে একটি মেয়ে যখন বিদেশীকে বিয়ে করে, কতখানি ত্যাগ ও কতখানি সাহস তার পেছনে থাকে।'

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'সে ত শুধু ঘর পাবে বলে। নিছক বাস্তব সংসারের হিসাবের কথা এটা।'

এ কথা সে পছন্দ করল না। প্রতিবাদ করে বলল, 'জর্জ, তুমি হয়ত কখনও প্রেমে পড়নি, তাই এ কথা বলছ। বিদেশিনীর প্রেম যে কত বড় হয়, তা তুমি কি করে জানবে?'

কথা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে দেখে বললাম, 'আচ্ছা তা না-হয় মানছি; এখন বল বেটির কথা।'

'বাকীটা বলে আর কি হবে? একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ঠেলা-গাড়ির সংসারে তাকে চা ঢেলে দিতে দিতে বিদায়ের কথা আর সর্দারের হুকুমের কথা বললাম। বাপ-মা আমার নাম দিয়েছিল রুডি। রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর মৃত্যুর খবরে শুনেছি বহু মেয়ে ঘরে বসে কেঁদেছিল। মরবার হুকুম পাওয়া রুডির বিদায়ের খবরে বেটির চোখের জল টপটপ করে চায়ের কাপে পড়তে লাগল—।'

আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আর তুমি কি করলে?'

'আমি কি করলাম? যদি তার সঙ্গে কথা কইতাম, তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম। তর্কও করতাম হয়ত। যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা হত। হয়ত সে আমায় ডাকত ওদের জগতে চলে আসতে। হয়ত হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতাম সর্দারের কাছে—তার

অনুমতি নিয়ে বেটিকে 'চুমিদাভ' দেবার জন্য। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলাম না। তার চোখের জল দেখে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলাম। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমার ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে খেয়ালও করতে পারলাম না কখন সে চলে গেছে।

'পরের দিন সকালে কেন তাকে আবার ডেকে আনলে না?'

'পরের দিন আমার আর ভোর হল না সে গ্রামে। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি আমাদের ক্যারাভ্যান চলতে আরম্ভ করেছে শেষ রাত থেকেই। আমার চার-চাকার ঘর লাইনের ঠিক মাঝে; সর্দারের গাড়ি ঠিক আমার পিছনে। একদৃষ্টে সর্দার চেয়ে আছে আমার ঘরের দিকে। যে ঘর গড়াই হল না, তাকে আর ঘর বলে লাভ কি?'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? আমার ভাঙা ঘরে রাঙা অতিথির স্থান হল না। তাকে ভাল করে কোনদিন শুধানো পর্যন্ত হয়নি, সে এ ঘরে তার চরণ দুটি পাততে রাজী আছে কি না—।

'কেন? তার সময় ও সুবিধা নিশ্চয়ই তুমি অনেক বার পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। কিন্তু কেন তুমি বুঝতে পারছ না যে, যে বেটিকে ডেকে এনেছিলাম খেলাঘরে খেলার জন্য—তাকে সে কথা শুধানো যেত না।' কিন্তু যে বেটিকে ভালবেসে ফেললাম তাকে তরীখানি আমার চোরাবালির চরে ভেড়াতে বলি কি করে? যে বাধা সর্দার সাংসারিক ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিল, তা যে আমার মনে বহু দিন থেকেই লুকোনো ছিল। চোখ বুজে ছিলাম প্রথম পরিচয়ের সময়, কিন্তু চোখ যখন খুলল দেখলাম যে, বেটি কত

দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সংসারে যত কাছে সে এগিয়ে এসেছে নিজে সে ততই সরে সরে গিয়েছে। কাছে এসে তাই সে দূর হয়ে গেল।'

এ যে বড় জটিল দর্শনের কথা হয়ে উঠল। একজন বেদের কাছে এরকম তত্ত্বকথা আশা করিনি। লোভ হল একটু আঘাত করতে—যদি আরো কোন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

হ্রদের ওপারে যেন নজর দিয়ে বলে উঠলাম, 'মনে হচ্ছে যেন এখানেই এ কাহিনীর শেষ নয়। যে দূর হয়ে গেল তার জন্য এত ব্যথা ত হবার কথা নয়।'

রুডিকে আঘাত অনুভব করান গেল না। সে বলল, 'কথা নয় ; তবু ব্যথা পাই। তোমরা সভ্যতার ঢাকনা দিয়ে ভালবাসা ভুলে যাও, নতুন করে প্রেমে পড়ে তার দার্শনিক ব্যাখ্যা তৈরি কর। আমাদের দর্শন নেই, আছে শুধু দুঃখ। আমরা বিয়ে করি সংসার করবার জন্য। সন্ন্যাসের মধ্যে আমাদের সংসার, যাযাবরতার মধ্যে স্থাবরতা। সবচেয়ে বড় সেই ধন—তাই আমার হল না এ জীবনে।'

সান্ত্বনা মাখানো সুরে বললাম, 'তাতে ত তোমার দুঃখ হওয়া উচিত নয়। মনে করনা কেন যে, একটি মেয়েকে ভালবেসে দুঃখের মধ্যে টেনে আননি। তাকে দুঃসাহসে সারা জীবনের মত ভবঘুরে হয়ে যাবার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছ সে থাকুক না তার নিজের জগতে, নিজের চেনা জানা সংসারের মধ্যে।'

গলার স্বরের কোন রঙ নেই। তবুও আলোতে ভেসে ওঠা তার মুখের ভেতর থেকে যে স্বর বেরিয়ে এলো তাকে ম্লান বলব আমি। সেই ম্লান কণ্ঠে যেন সুদূর থেকে ভেসে আসল তার কথা, 'সে সুযোগই ত তাকে দিলাম আমি বিনা তর্কে, বিনা বাধায়। কিন্তু আজ নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি সেজন্য। কেন জান?'

হঠাৎ তার স্বরে পরিবর্তন লক্ষ্য করে চমকিয়ে উঠলাম। যে রূঢ় রুক্ষ ভাষায় সে আমার সঙ্গে ঘরের মধ্যে কথা বলছিল, সেই স্বর তার ফিরে এসেছে। হঠাৎ নতুন কোন আলোচনার জন্য তৈরী হলাম।

রুক্ষ ভাবে সে বলল, 'কি লাভ হয়েছে আমার তাকে সে সুযোগ দিয়ে? বেটি কি সুখী হয়েছে তার পরিচিত সংসারের মধ্যে? তার কি লাভ হয়েছে রোমান্সের লোভ সামলিয়ে নিয়ে? আজ—আজ সন্ধ্যাবেলায় তাকে দেখলাম আমাদের ক্যারাভ্যানের কাছে। তার ঠেলাগাড়িতে দুটো বাচ্চা; দেখলেই বোঝা যায় যে, ভাল করে খেতে পায় না। য়্যাপ্রনের কোণা ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে আরো একটা —খিদে আর অতৃপ্তি তাদের মুখে মাখানো। বিনা পয়সার মজা দেখাতে এনেছে তাদের বেটি,—সেই মহিলা, আধ ময়লা আধ ছেঁড়া কাপড়ে, আধ ভাঙা চেহারার একটা মেয়ে।'

চুপ করে রইলাম। রুডিও চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ।

তারপর সে নিজেই আবার শুরু করল, 'জানো, তাতেও আমি তত দুঃখিত হইনি। ভেবেছিলাম তার ভাগ্যে এইরকমই ছিল। কিন্তু কষ্ট হল যখন দেখলাম তার মধ্যের মহিলার মৃত্যু হয়েছে। সে আবার অনেক কাছের, হাতের মুঠোর মধ্যের মেয়ে হয়ে নেমে এসেছে—'

প্রতিবাদ করে বললাম, 'তা কি কখনো হয়। আমি ত ভেবে-ছিলাম সে চিরকালের জন্য তোমার কাছে মহীয়সী হয়েই শোভা পাবে।'

মৃদু স্বরে সে বলল, 'সেখানেই ত হয়েছে তার মৃত্যু।' বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে বলল, 'জানো, তার হাতের ছেলেটার মুঠোর মধ্যে আমি একটা সোনার গিনি পুরে দিয়েছিলাম। কোন কথা বলিনি। চিনতে পেরেছি এ লজ্জা যেন সে না পায়।

কিন্তু সে কি করল তা জান? একটু দূরে সরে গিয়ে ছেলেটার হাত থেকে নিয়ে দেখল আমি কি দিয়েছি। তারপর মিষ্টিভাবে হাসবার চেষ্টা করে আমায় একটা চুমু ছুঁড়ে মারল। সে চুমু আমায় চড়ের মত এসে লাগল। আমি দৌড়ে পালিয়ে গেলাম আমার কামরার ভেতরে। যে ঘরে বসিয়ে তাকে সিংহাসনে বসাতাম মনে মনে। যেখানে একটা চুমু পর্যন্ত দিয়ে তাকে কখনো অপবিত্র করতে ইচ্ছা হত না— সেই ঘরে।'

ভাবতে লাগলাম: যে ঘর কোনদিন গড়াই হল না, সে ভাঙা ঘরের অতিথির এ পরিণামের জন্য এত দুঃখ কেন? যে আসেই নি, তার চলে যাওয়ায় কি বা যায় আসে? কোথায় শিখল সে এত মর্মান্তিক মনস্তত্ত্ব, কোন্ মানবতার বিশ্ববিদ্যালয়ে?

কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। মুখ তুলে দেখি, শক্ত সমর্থ ওই রোমানি রুডি মাথা নীচু করে দূরে সরে যাচ্ছে। জংলী লতাপাতা ঝোপ দু'হাতে সরিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে—যেন কত দুর্বল, কত অসহায় সে। ভেঙে পড়েছে তার শিরদাঁড়া, পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের মধ্যে মর্মরিত হচ্ছে পরাজয়ের বেদনা।

কোন প্রশ্নই করতে পারলাম না। আলো-আঁধারের আড়ালে মিলিয়ে গেল সে—যেমন করে তার স্বপ্নে গড়া ঘর মিলিয়ে গিয়েছে।

সোনার সন্ধ্যা

সোনিয়াকে আমি ডাকতাম 'সোনা' বলে। এমন একটা সার্থক নাম পৃথিবীতে কেউ বোধ হয় তার প্রেয়সীকে দেয়নি।

সোনিয়ার গায়ের রঙ ছিল সোনারই মত সুন্দর। রূপের আগুনে ভরা। সাধারণ রাশিয়ানদের মত বেরঙ সাদা নয়। কৃষ্ণসাগরের রোদ তার রূপকে সোনালী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল আর তার এলিয়ে পড়া চুলগুলি দিয়ে যেন ভল্‌গা নদীর সোনার ধারা ঝরে পড়ত। দেখলেই মনে পড়ত বৈষ্ণব কবিতার অমর বর্ণনা—থির বিজুরী বরণ গোরী।

সোনার বরণী ছিল আমার সোনা।

আর সোনাকে এ নাম দিয়েছিলাম আমি—স্বর্ণময় সেন। আমার কথা এই ত্রিশ বছর পরে বাঙলাদেশে কারও মনে নেই। বাপ-মা ছেলের এই নাম রাখবার সময় ভবিষ্যতে কত সুবিধা হবে এই নামে তা স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁদের সোনার চাঁদ ছেলে। আমাদের দেশের হিসাবে কাঁচা সোনার মত ছিল রঙ। আর চাঁদের মতই ছিল আমার মুখচন্দ্র—সহজেই চীনে বলে বিদেশে নিজেকে চালিয়ে দিয়েছিলাম। নামটাও তখন সান ইয়াৎ সেনের পৃথিবীজোড়া নামের কল্যাণে চীনে বলেই চলে যেত। আহা, বাপ-মার এত আদরের ছেলে হয়ে গেল ভবঘুরে—সেই বিশ বছর বয়সেই। শুধু অজানা এডভেঞ্চারের আলেয়ার পেছনে। সম্বল রইল শুধু বাঙালী-দুর্লভ দেহ ও বিদেশী ভাষা চট্ করে শিখে ফেলবার ক্ষমতা। এই দুটি মূলধন নিয়েই আমি কয়েক বছর মস্কোতে একটা বিদেশী এমব্যাসীতে অনুবাদকের কাজ নিয়েছিলাম। শুধু যে অনুবাদক তা নয়। এত দিন পরে স্বীকার

করতে বিপদ নেই যে, মঙ্গোলিয়ান চেহারা আর সানো মায় সেন এই নামের সুবিধা নিয়ে সেই রাজদূতাবাসের হয়ে স্পাইগিরিও করতাম একটু আধটু। ফলে স্বর্ণময় সেনের পকেটে টাকার অভাব কখনও হয়নি। ১৯১৭-১৮তে মস্কোর কোন্ নাচঘর, কোন্ থিয়েটার বা নাইট ক্লাব সেনস্কিকে না চিনত?

আজ তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। বাড়ির কোণের পার্কে বসে আমার সমবয়সী স্বদেশী বাঙালীদের কাছে রোজ বিকেলে শুনি ওসব দেশের কাফে রেস্তোরাঁ, নাচঘর এসবের মেকী সোনালী রঙের সমালোচনা। চুপ করে শুনি। আর শোনে দেবদারু গাছ-গুলি। ওরা মাথা দুলিয়ে নীরবে প্রতিবাদ করে। আমি, অতীতের সেনস্কি, তাও করি না। শুধু ভাবি, কি যে সোনার সন্ধান পেয়ে-ছিলাম তা তোমরা স্বর্ণময় সেনের দেশের লোকরা ভাবতেও পারবে না।

হোটেল মেট্রোপোল সেদিন শনিবার রাত্রিতে স্ফূর্তিতে গা ঢেলে দিয়েছিল। এত আলো, এত রঙ, এত সৌরভ। ছোট ছোট ঝোলানো বারান্দা প্রকাণ্ড হলটাকে ঘিরে রেখেছে। তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ক্যাবিনেট অর্থাৎ নিরিবিলি কামরাগুলি। সেখানে সকলের নজর এড়িয়ে রুবল (রাশিয়ার টাকা; তখনকার দিনে ১৮০ আনা আন্দাজ দাম ছিল) ও শ্যাম্পেনের খেলা চলে। আর তার সঙ্গে দরকার হলে একটু আধটু ভাড়াটে প্রেমের লীলা পর্যন্ত। রেস্তোরাঁর হলে ছোট ছোট টেবিলগুলি গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে। চারজনের টেবিলই বেশী। কিন্তু বেশী প্রিয় হচ্ছে দু'জনের টেবিল-গুলি। সেখানেই গানবাজনা ভেসে আসে বেশী—যদিও তা কানে ঢোকে না। শ্যাম্পেন ফূর্তির বুদ্বুদে যেন মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এদিকে দু'জনে বিভোর হয়ে থাকে এমনভাবে যে, সে মদ হয়ত ওরা

খেলই না। কিন্তু রেস্তোরাঁর যত মৃদু গুনগুনানি সবই ওই টেবিল-গুলি থেকে ওঠে। খানাপিনার জন্য দু'জন ; আবার দু'জনের জন্যই খানাপিনা। সবাই ওদিকে চোরা চাউনিতে তাকায়। অবশ্য মনে হবে যে, তাকিয়ে দেখছে না কেউই। ঘরের একটা কোণে উঁচু বেদীর ওপর অর্কেস্ট্রা চালায় এক শিল্পী। দেখে পোলিশ মনে হয়। রাশিয়াতে বিদেশী না হলে শিল্পীর আদর তখন হ'ত না।

শিল্পেরও আদর হ'ত না বিদেশী না হ'লে। তাই একটা যাযাবর সঙ্গীত বাজান হচ্ছিল। তার করুণ মূর্ছনা বেহালার ছড়ের আঘাতে কেঁদে কেঁদে ঘরময় লুটোচ্ছিল। আর আমি হাতলওয়ালা ফুলের সাজির আকারের একটা গরম রুটির ওপর রাখা দামী "কাভিয়ার" খাচ্ছিলাম। সুরের করুণতার সঙ্গে মিতালি রেখে ঘরটিকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে। তার মধ্যে থেকে ফুটে বের হচ্ছে হীরে-জহরতের আলো। চারদিকে রূপসী নারী। মদের মত গান, আর গানের মত মদ। স্বর্ণময় সেন তখন কোথায়? সেনস্কি স্বর্গে উঠে গিয়ে আবেশে চোখ বুজে জিপসী সঙ্গীতের তালে তালে দামী কার্পেটে পা ঠুকছে।

এমন সময়ে তীব্র আওয়াজ হ'ল রিভলভারের। উপরের এক ঝুল বারান্দায় একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ও তার পরেই মিলিটারী বুটের আওয়াজ জেগে উঠল হলটাতে।

পুলিসের ও মিলিটারীর খানাতল্লাসী শুরু হল পুরোপুরি। ১৯১৭ সালের মস্কোতে এটা মোটেই নতুন জিনিস নয়। ওদের কাণ্ডকারখানা সাধারণ লোকের বেলা যেমন ভীষণভাবে চালান হত, বড়লোক বা বড় চাকুরেদের বেলা ঠিক তার উল্টো। বিদেশী এমব্যাসীর লোক বলে আমিও নামমাত্র প্রশ্নের পরেই ছাড়া পেলাম। কিন্তু পেলে না সোনার বরণী এক তরুণী।

ওই বিরাট হলে শুধু তারই কোন পরিচয় ছিল না। ওখানে আসার জুতসই কারণও খুঁজে পাওয়া গেল না। পাশের টেবিলেই সে একা বসেছিল, তা দেখেছিলাম। ভীরু হরিণীর মত চাউনি ছিল তার। নতুন সোয়াদের মধ্যে সে মজতে চাইছিল বলেই এসেছে মনে হচ্ছিল। লোভ হচ্ছিল যে উঠে তার টেবিলে গিয়ে বসি, পরিচয় করি, পরিচয় করিয়ে দিই তাকে এখানকার ফুর্তির গোপন-রহস্যের সঙ্গে। কিন্তু পারি নি। বনবালা শকুন্তলাকে ফুর্তির ফোয়ারার তলায় খোলাখুলি নিয়ে আসার লোভ সামলিয়েই বসেছিলাম।

এখন বুঝতে পারলাম যে, রাজনৈতিক খুনের দায়ে এই নিরীহ তরুণী ধরা পড়েছে। অতএব একে পুলিপোলাও চালান যেতে হবে সাইবেরিয়ায়। ভাবতেই—ওই বরফের দেশে নির্জন নির্বাসনের কথা ভাবতেই মাথা গরম হয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম পুলিসের সামনে।

আমার বিদেশী এমব্যাসীর সম্মান ও তার চেয়ে বেশী রূপোর ঝনঝনানিতে সোনিয়া সেই রাত্রেই ছাড়া পেল। বেচারী বালিকা বিদেশে ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপের উপর নির্ভর ক'রে পড়ে। কচি বয়সের কৌতূহল সামলাতে না পেরে একলাই সে এই নাইট ক্লাবে এসেছিল এক রাত্রির জন্য। গোপনে সে একটিবার মাত্র হোটেল মেট্রোপোলের শনিবার রাত্রিটিকে দেখে যাবে। এই অভিসার কেহ জানতেও পারবে না, এই ছিল তার মতলব। তার বদলে হঠাৎ এল সাক্ষাৎ যমের মত সাইবেরিয়ায় পুলিপোলাও চালান। নিদেন পক্ষে চারদিকে জানাজানি, স্কলারশিপ হারানো ও ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে যাওয়া। কিন্তু সব কিছুর বদলে তার জীবনে উদয় হ'ল সেনস্কি।

তার পরের দিনগুলির কাহিনী অরুণরাগে রাঙানো। একই পৃথিবীতে আমরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছি। সে যায় কলেজে, আমি

যাই আপিসে। কিন্তু সন্ধ্যাগুলি যেন রামধনুর মত বিচিত্র রঙে সেজে আকাশকে ছুঁয়ে নেমে আসে। আমাদের দু'জনের মধ্যে সেতু রচনা করে। সেই সেতু বেয়েই ত আমরা সারা দিনের অসহ বিরহ, দুই দেশের দুই মনের এতখানি দূরত্ব মুছে নিই। দু'জনের কাছে আনা-গোনা করি গোপনে। এমন ভাবেই দিনগুলি চলছিল।

শুধু বিকেলের একটুখানি সময় হাতে। তাই আমরা যাই নাচঘরে, অপেরায়, রেস্তোরাঁয়। সোনিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠতে না উঠতেই গীর্জার ঘড়ি ফিরবার নোটিস দেয় তাকে। উপায়ই বা কি? আমাদের সময় কাটে পথে, না হয় নাচঘর বা ওই রকম কোথাও।

তারই মধ্যে একটুখানি বেশী সময় পাই শনিবারগুলিতে। দুপুরের পরে আমার কাজ নেই; বিকেলে নেই তার ক্লাস। একদিন আমরা শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলাম জিপসী সঙ্গীত শোনবার জন্য। "ট্রয়কা"য় (আরবী ঘোড়ায় টানা গাড়ী—রাশিয়ার রথ) চড়ে আমরা পাড়ি দিলাম সুদূরে।

সেদিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। ক্ষুরের মত ধারাল শীত আর মুষলধার বৃষ্টি, দু'য়ে মিলে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে যদিও আমি রুশীয়-মঙ্গোলিয়ান সানো-মায়-সেন, মস্কোর সেনস্কি—আমার চৌদ্দ পুরুষ বাঙালী।

একটা কাচের প্রাসাদ—বরফে ঢাকা। তার ভিতরে গরম দেশের পাম গাছ সাজান। অদ্ভুত, একেবারে পূব দেশের ব্যাপার। কাঠের গন্‌গনে আগুন দাউদাউ করে খোলা 'ফায়ার প্লেসে' জ্বলছে। তার কাছে আমরা বহু লোক জমা হয়েছি। এক জিপসী গায়িকার সঙ্গে এল চারজন বেদে। রঙীন ট্রাউজার ও সাদা ব্রোকেডের জামা পরা। এল আরো চারজন বেদেনী রঙীন রেশমী রুমাল মাথায় বেঁধে।

সামনে প্রকাণ্ড লম্বা গ্লাসে ঢেলে দিলে চারোচ্‌কা নামে মদ। গান শুনতে শুনতে টেনে নিতে হবে এক চুমুকে আর এক নিঃশ্বাসে। কিন্তু কেবল তখনি, যখন গায়িকা এসে সামনে দাঁড়াবে। তারপর গ্লাস উপুড় করে রেখে দেখিয়ে দিতে হবে যে একটি ফোঁটাও বাকী নেই।

আমার মন কিন্তু ছিল না এ গানে। তারা দরদী গলায় আদিম বিষাদ ভরা গান গাইছিল। এ-ই স্লাভ জাতির বিশেষত্ব। ঠকে যাওয়া মানুষের ব্যথা ছবির মত সে গান ফুটে উঠছিল। তবু আমি মনোযোগ দিতে পারি নি। মনে মনে বুঝছিলাম যে আমাদের এই সুখের বিহার হয়ত এই জিপসী গানের সুরের মতই শীঘ্রই শেষ হয়ে আসবে। বাইরের যুদ্ধে হার হয়ে যাচ্ছে, ভিতরে খাবারের অভাব হয়েছে। রাশিয়া প্রায় বানচাল হয়ে এসেছে। যে-কোন সময়ে উল্টে গেলে আমরা সবাই একসঙ্গে ডুবে যাব।

সত্য কথা বলতে কি, রাশিয়া দেশটাই হচ্ছে বিষাদের দেশ। ওরা জন্ম থেকেই অনুভব করে বিষাদ—যেমন ভাবে আমরা অনুভব করি অবসাদ। কিন্তু ঘরছাড়া, ঘরহারা সেনস্কির তো বিষাদ বা অবসাদ কোনটাই অনুভব করবার কথা নয়। সোনিয়ার সঙ্গ হচ্ছে সোনালী আগুনের তাপে ভরা। তার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে তো আর বিষাদ বা অবসাদ কোনটাই আমার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি যখন ওকে ভালবাসতে আরম্ভ করলাম আর বুঝতে পারলাম যে সেও আমাকে ভালবাসতে শুরু করেছে তখন থেকেই রাশিয়ান বিষাদে মন ঢেকে গেল। আজ ভেবেছিলাম যে, শহর থেকে অনেক দূরে নতুন রকমের সন্ধ্যা কাটানোর মধ্যে, হাসি গান হৈ-হল্লার মধ্যে এ বিষণ্ণতাকে বিদায় দিতে পারব। সে আশাতেই এখানে এসেছিলাম। জিপসীরা একটার পর একটা "চারোচ্‌কি" গান গেয়ে যাবে।

হাতে হাতে ভরে দিয়ে যাবে চারিদিকে একটার পর একটা গ্লাস। সবাই হয়ে উঠবে মাতোয়ারা। চারদিকে ছড়ানো আনন্দের মধ্যে আমরা ডুবে যাব।

গানের ঘরটি খুব সরগরম হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে আমরা দু'জনে বাইরে চলে এলাম। ছোট্ট একটা হ্রদের পাশে এই জিপসী প্রাসাদ। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে জলের ধারে আমার মনে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে দোলা দিতে লাগল। আলগোছে আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে সোনা প্রশ্ন করল, 'তুমি আজ অত কি ভাবছ?'

'না, কই কিছু ত ভাবছি না!'

'না, কিছু ভাবছ না ত করছ কি? বেদের গানে এত কি মজা পাচ্ছ তা হ'লে যে কথাও কইছ না! তা আমি তো ভেবেছিলাম যে তোমাদের অঞ্চলেও অনেক বেদে আছে আর তাদের গান তোমাদের কাছে নতুন নয়।'

'কিন্তু আমি তো মঙ্গোলিয়ান রুশ নই। আমি ইণ্ডিয়ান আর কলকাতায় আমার বাড়ী।'

মধুর হেসে উঠল সোনিয়া। বললে, 'সেনস্কি, তুমি বোধহয় নতুন একটা তামাশা শুরু করলে আমার সঙ্গে। টাগোরের ছবি আমি দেখেছি। তুমি যদি তার দেশের লোক হও তবে আমিও নতুন একটা দেশ বেছে নেব। নিজের ব'লে চালাবার জন্য।'

আমি চঞ্চল হয়ে প্রতিবাদ করলাম। বললাম, 'জীবনে অনেক মিছে কথার আশ্রয় আমি নিয়েছি, সোনা! আমার ভবঘুরে বৃত্তি। আমি ভারতীয় একথা জানাজানি হলে আমার চাকরি নিয়েও টানা-টানি হবে হয়ত এই যুদ্ধের বাজারে। তবু তোমার কাছে আমি সত্য কথা খুলে বলবই। আমি রুশীয় নই, ভারতীয়।'

চুপ করে রইল সোনা। চুপ করে নিস্তব্ধ হয়ে রইল হ্রদের

জলরাশি—শুধু আমার হৃদয়ের রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে সোনার মুখের কথার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

খানিক পরে আমিই সে নীরবতা ভাঙলাম। বললাম, 'সোনা, সোনিয়া, আমার দেশ আমাদের মধ্যে কি কোন ব্যবধান আনল?'

কোন উত্তর নেই। আবার ডাকলাম। কিন্তু কোন সাড়া নেই।

রাশিয়ান মন আজো আমি বুঝে উঠতে পারিনি। না হলে শুধু একটি তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এমন করে সোনা চুপচাপ মেরে গেল!

'ট্রয়কা'তে চড়ে একসঙ্গেই ফিরে এলাম। পথে যেতে যেতে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবলাম তার আর ইয়ত্তা নেই। কেন সোনা এত নীরব রইল। সে কি বিদেশী বলে ঘৃণা করবে আমায়? রাশিয়ার দূর প্রান্তের প্রদেশগুলি ত প্রায় বিদেশই বটে, আর সে তো আমায় মঙ্গোলীয় বলেই ধরে নিয়েছিল। ভারতীয় কি তার চেয়েও বেশী বিদেশী?

তবে কি ভারতীয় বলে সে আমায় হেলা করলে? তাও ত নয়। যে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছে, তাঁর কবিতার অনুবাদ পড়েছে—সে ত এ রকম করতে পারে না। আর রাশিয়ানরা ত ভারতকে মোটেই নীচু চোখে দেখে না।

তবে? পুরো একটা সপ্তাহ অভিমান? প্রশ্নে ভরা মন নিয়ে আমি চুপ করে রইলাম। রেস্তোরাঁ ও রাজপথ দুই-ই ছেড়ে দিলাম। আপিস থেকে বাসায় সোজা চলে এসে ডাকের প্রতীক্ষা করতাম। কিন্তু তার কোন সাড়াই পেলাম না। সারাটা সোনার সন্ধ্যা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থেকে থেকে অধীর হয়ে পোশাক ছেড়ে কালো পাড় দেওয়া লাল রঙের কশাক পায়জামা পরে বিছানায় শুয়ে পড়তাম। তখন নিজেকে এত অসহায় মনে হ'ত! এতদিন প্রেমের কবিতা পড়িনি।

ভাবতাম ওসব জিনিস মানুষের উদ্ভট কল্পনার ছবি। নিজের জীবনে যখন প্রেমের সত্যিকার অনুভূতি এল তখন কবিতা পড়ার সময় বা প্রয়োজন ছিল না। দুই-ই এল তখন, যখন প্রেম সোনালী সন্ধ্যার মত জীবন থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

ভাল লাগত না কিছুই। প্রেমের কবিতাও নয়। শেষে এল অভিমান। বেশ। শুধু একটা সত্য কথা, যেটা লজ্জা করার মত কিছু নয়, তারই প্রকাশে যদি প্রেম উবে যায় কর্পূরের মত, তাকে যেতে দাও। এই রাশিয়ার বরফের মতই যদি তা সত্যের উত্তাপে গলে যায় তবে যাক। বুঝে নিলাম যে রাশিয়ান প্রেম তুষারশীতল। কিন্তু তা গলে প্রাণগঙ্গারূপে বয়ে যাবার জিনিস নয়।

কিন্তু হায়, অভিমানে ত মন মানে না। প্রেমকে কি এত সহজে মন থেকে সরিয়ে রাখা যায়? সোনিয়া না হয় আর নাই দেখা করতে আসে, আমিও ত আর তার খবর নিইনি। কে জানে সে হয়ত এর মধ্যে আমার খোঁজ করে ফিরে যাচ্ছে কতদিন। সে নিজেও হয়ত কত কষ্ট পাচ্ছে আমার কথা ভেবে, আমি তার খবর নিচ্ছি না বলে। অথবা কে জানে হয়ত তার অসুখও করে থাকতে পারে সেদিনকার দুরন্ত শীতের রাতের অভিসারের পর।

এ কথা মনে হবার পর আর চুপ করে থাকতে পারি না। তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইলাম এবং আবার দেখা হওয়ার বন্দোবস্তও করলাম। যাতে ভালভাবে কথাবার্তা হতে পারে এবং তার মন বুঝতে পারার মত অনেকখানি সময় পাই তার জন্য একটা ভাল মোকাও মিলে গেল। আমারই আপিসের এক বন্ধু ভ্যাসিলি সপরিবারে শহরের বাইরে একটা 'ডাসা'য় (গ্রামের বাসায়) উইক-এণ্ড কাটাতে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে হালে সোনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, আমার একটু ইঙ্গিতেই ভ্যাসিলি ও তার স্ত্রী সব বুঝে

নিলে। তাদের নিমন্ত্রণ সোনিয়া সহজেই গ্রহণ করলে। ভ্যাসিলি বড় ভাল লোক আর বড় দরদী বন্ধু।

তারই সুযোগ নিলাম আমরা। তারা সন্ধ্যার দিকে বাইরে বেড়াতে গেছে এমন সময় এল ঝড়বৃষ্টি। শুধু সোনিয়া ও আমি মুখো-মুখি বসে আছি দুটো চেয়ারে। এর মধ্যে সেদিনের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা হয়নি। যথেষ্ট সময়ও আমরা পাইনি। আজ আমি সে কথা তুললাম। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কোন কথাই শুরু করতে সাহস পাই না। বাঁশীতে ফাটল ধরেছে কিনা আগে একটু বাজিয়ে দেখা ভাল।

ঘরটার মাঝখানে দেওয়ালে হেলান দেওয়া একটা আয়নার সামনে ঝড়ের হাত থেকে আশ্রয় নিয়ে বসেছে দুটো পাখী—চড়ুই পাখীর মত দেখতে। বললাম, 'দেখেছ সোনা, ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে; তাই ঠোঁটে ঠোঁটে ঠোকাঠুকি করে সরে যাচ্ছে আয়নার সামনে থেকে।'

হেসে সে বললে, 'সেনস্কি, তুমি বোধহয় মস্কোর পাখীদের কথা ভাবছ। এরা কিন্তু হচ্ছে বনের পাখী। তাই ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে আদর করছে; ঠোকাঠুকি নয়।'

'তা হ'লে আয়নার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে কেন?'

'বাঃ রে, ওদের বুঝি লজ্জাশরম নেই? আয়নায় নিজেদের কাণ্ড দেখে নিজেরাই লাজে সরে যাচ্ছে, কিন্তু দেখ আবার এগিয়ে আসছে।'

ওর কথায় আশা পেলাম। বললাম, 'দেখ, এই ঝড়ের মধ্যে পড়ে পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে এসে আমরাও হয়েছি ঝড়ের পাখী। আমার সোনা-পাখী কিন্তু সেদিন শুধুই সরে গেল, আর এগিয়ে এল না।'

'কে বলে, সে সরে গিয়েছিল?'

'তবে তুমি এমন চুপ করেছিলে কেন ?'

'বাঃ, আমার বুঝি ভাবতে নেই ?'

'আর আমার বুঝি ভাবনাকে ভাগ করে নিতে নেই ?'

'কিন্তু সব জিনিস ত ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় না।'

'এ জিনিসটা নিশ্চয়ই নেওয়া যায়। আর তুমি ত জিজ্ঞেসও করলে না, কেমন ভাবে আমি কাটিয়েছি এই ক'টা দিন।'

খাঁটি রাশিয়ান প্রকৃতি তার। সে হেসে বললে, 'যা কাটিয়ে দিয়েছ তার কথা থাক। তুমি কি করেছ তা আমি ভাল করেই জানি। ওই তোমার প্রিয় পুশকিনের কবিতা আওড়েছ। এখনি হয়তো অভিযোগ করে বলবে :

When you're away, I yawn and mope ;
When you are here, I ache and pine :
I recognise by every sign
I've lost my heart beyond all hope.'

অভিমান করে বললাম, 'থাক থাক, আমি কেমন করে কাটিয়েছি তার কথা থাক। তুমি ত মহা সুখে আপদ্ চুকল মনে করে স্কলারশিপ পাবার পথটা ভাল করে তৈরি করছিলে। যেমন মনের আনন্দে কবিতা আওড়াচ্ছ তাতেই বোঝা যাচ্ছে।'

সে ক্ষুণ্ণ হ'ল এ কথাতে। কিন্তু ক্ষোভের চেয়ে বেশী তার সহানুভূতি। স্বরে জড়তা নেই একটুও। কিন্তু দরদ দিয়ে সে বললে, 'না, তা নয়, আমি সব পথই আঁধার দেখছি। আমাদের দেশের চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সমাজে রাষ্ট্রে নির্ঘাত বিপ্লব এসে পড়ছে। তার মধ্যে কোন আশা খুঁজে পাচ্ছি না।'

ঝোড়ো হাওয়া আরো প্রবল হয়ে এল। বাজে যেন মস্কোর আকাশ চৌচির হয়ে গেল। বহু দূরে ক্রেমলিন প্রাসাদের নীল ও

সোনালী চূড়ার উপর বিদ্যুতের আতশবাজি খেলতে লাগল। সোনিয়া তার চেয়ারটা টেনে এনে একটু নিবিড় হয়ে আমার পাশে বসল।

সে বলতে লাগল, 'জান, আজ রাশিয়াতে প্রত্যেক অল্পবয়স্ক বা চিন্তাশীল লোক হচ্ছে বিপ্লবী। আমরা এই অত্যাচার অবিচার ভরা রাজত্ব উচ্ছেদ করে দিতে চাই। যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি। ওই ঘুষখোর ঘুণধরা রাজ্য আর সমাজের জন্য আমাদের অবস্থাপন্ন লোকেরাও কাশা (সরু চাল ও মাংসের ঝোল) পর্যন্ত খেতে পাচ্ছে না। সব তো তুমি জান। তোমাদের রাজদূতাবাসে কোন খবরই অজানা থাকবে না।'

একটু থেমে সে আবার বললে, 'ওই দেখ দূরে ক্রেমলিনের চূড়াগম্বুজের চারপাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমাদের পার্টির সভ্যেরা এই সময়েই লোকদের মধ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, ওই বিদ্যুৎ চমকানতেই জারের সাম্রাজ্য যে ছারখার যাবে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।'

বললাম, 'সে সবই ত জানি। চাকরির খাতিরে আমি নিরপেক্ষ হলেও তোমার মনকে যে এসব ব্যাপার তোলপাড় করে তুলবে, তাও বুঝতাম। কাকেই বা না করে? কিন্তু তুমি কি লেনিনের দলে সত্য সত্যই ঢুকেছ?'

সন্ধ্যাতারার মত উজ্জ্বল চোখ দুটি আমার দিকে তুলে সে বলল, 'হ্যাঁ, হালে আমি ঢুকেছি। আর সেজন্যই আমি তোমায় ভালবেসে কষ্ট দিলাম ও পেলাম। ছাড়াছাড়ি আমাদের মধ্যে ত হবেই।'

ম্লান চঞ্চল চোখে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলব ভেবে পেলাম না। উদ্বেগে মনে হ'ল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

সে বলে চলল, 'আমি ভেবেছিলাম, তোমাকেও আমাদের গোপন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে নেব। কিন্তু তোমার যা চাকরি অতে তোমার

চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে। তা ছাড়া, হায়, তুমি ত বিদেশী আর এ মন্ত্রে অবিশ্বাসী। তোমার ও আমার পথ এক নয়।'

সে কথা ঠিক। আমি কোনদিনই গোপন অগ্নিমন্ত্রে বিশ্বাস করিনি। ভবঘুরে ডানপিটে হতে পারি, কিন্তু এসব কাজ আমার ধাতে সইবে না। তা ছাড়া ভালবেসে সোনিয়া হয়েছে মরিয়া, আর আমি চেয়েছি বাঁচতে। তাই চাই তাকে বাঁচাতে।

তবু বললাম, 'এখন বুঝছি তুমি সেদিন কেন এমন করে চুপ করে গেলে আমি ভারতীয় শুনে। কিন্তু তাতেই বা কি ? তোমাদের মন্ত্র ত শুধু রাশিয়ার জন্য নয়, বিশ্বের জন্য। কাজেই আমি তোমাদের দলে না গেলেও তোমার ভালবাসা ত পেতে পারি। তুমি আর আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। তুমি আমায় ভালবাস এমনি করে।'

ম্লান অথচ বলিষ্ঠ একটা হাসির মধ্যে দিয়ে তার কথা ফুটে বের হ'ল, 'তা হয় না, সেনস্কি। তুমি আমায় ভালবাসবে, অথচ আমার পথে আসবে না। তাহলে আমাদের লোকেরা তোমায় জারের বা শত্রুপক্ষের চর মনে করবে। তুমি আমার পথে বিশ্বাস না করেও, বিদেশী হয়েও আমাদের সঙ্গে নাম লেখাবে এমন অন্যায় আমি হতে দেব না কিছুতেই—'

বলতে বলতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমারও মন আলোয় ভরে গেল। আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, 'কিন্তু আমিও যদি তোমার পথে আসি, তোমার মন্ত্রে দীক্ষা নিই তাহলে ত কোন বাধা নেই।'

কঠিনভাবে ঠোঁট চেপে একটুখানি চুপ করে রইল সোনিয়া। পরে বলল, 'তাতেও বাধা আছে। আমি তোমায় ভালবাসি এবং সেজন্যই ভালবাসার ব্যভিচার তোমায় করতে দেব না। তুমি আমায় ভালবাস, কিন্তু আমার দেশকে নয়, আমার মতকে নয়।'

'তবে, তবে আমাদের ভালবাসা কি এখানেই শেষ হবে?'

যে উত্তর পেলাম তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ইহলোকের বাসনা কামনা সব কিছুকেই আমরা ভারতীয় মনে অতীন্দ্রিয় রূপ দিয়ে পরলোকের হিসাবের কোঠায় তুলে দিয়েছি। সে প্রেম মিলনকে দিয়েছে মাধুরী, বিচ্ছেদকে দিয়েছে সান্ত্বনা। কিন্তু রাশিয়ান চরিত্র অন্য ধাতুতে গড়া। তারই সবল বাস্তব ফল হচ্ছে সোনিয়ার এমন করে ভালবাসা।

সে বললে, 'সেনস্কি, তোমাদের টাগোরের প্রেমের কবিতা আমি পড়েছি আগেই। তোমার মনের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার মিল আমি অনেক দিন আগে থেকেই লক্ষ্য করেছি। কারণটা অবশ্য আগে জানতাম না। তুমি রাগ ক'রো না, তুঃখ ক'রো না। কোন অভিমান না করেই আমি বলছি যে, তোমরা আকাশে মাথা তুলে হাঁট আর আমরা মাটিতে পা ফেলে চলি। সবাই এগিয়ে যাই, কিন্তু পথ আমাদের আলাদা।'

বেদনায় প্রায় কেঁদে উঠে আমি বলে উঠলাম, 'না, না সোনা, আদর্শ কখনো আলাদা হতে পারে না। আমরা ভালবাসি, সেটাই সত্য। আজকের ঝড়, বিপ্লব সবই ত শেষ হয়ে যাবে এক দিন। তোমার মনে রেখো ভালবাসা, আমার মনে রাখব চিরকাল ধরে আশা। সেটাকে আমাদের অবলম্বন হতে দাও।' বলতে বলতে তার শীতল বিবশ হাত তুটি চেপে ধরলাম।

কড়-কড়াৎ শব্দে একটা বাজ কাছেই ফেটে পড়ল! বিত্যুতের আলোয় চকিতের জন্য দেখলাম তার মুখখানি চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। আর আমি? লোকে বলে পাথরের মত দেহের ভিতরে আমার পাথরেরই মত মন। তা যে একবার মাখনের মত গলে গিয়েছিল তা ত কেউ জানে না।

সোনা বললে, 'তুমি নিশ্চয়ই এত দিনে বুঝতে পেরেছ যে আমরা মাটির মানুষ। আমাদের প্রেম মাটির, যদিও আগুনের আভায় তা সোনা হয়ে ওঠে। আমি তোমার মত ভালবাসার আশা নিয়ে মন বেঁধে বসে থাকায় সান্ত্বনা পাব না।'

আমার হাত দুটিকে সে সবলে নিজের মুঠিতে নিয়ে বললে, 'বুঝতে কি তুমি পার না, আমার কামনা আকাঙ্ক্ষা সবই পেয়ালার শেষ তলানিটুকু পর্যন্ত আমি পেতে চাই? যাকে ভালবাসি তাকে চাই শুধু হৃদয়ে নয়, সংসারে। শুধু প্রিয়রূপে নয়, স্বামীরূপে।'

আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি ততক্ষণে; বললাম, 'আমিও ঘর বাঁধতে চাই। এদেশেই এখানেই হবে আমার ঘর। হও তুমি আমার সহধর্মিণী।'

অসহায় সুরে সোনা বললে, 'না না, আমার যে চাই সহকর্মী। যে নিজে থেকে নিজের বিবেক নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে—সে ত তুমি নও। আর তোমার বদলাবারও সময় নেই। মেঘ জমে গেছে; বাজ পড়ছে। ঝড় বইবে দু'এক দিনের মধ্যেই।'

তা আমি জানতাম; কিন্তু এত যে তাড়াতাড়ি তা আমি কেন, জার দ্বিতীয় নিকোলাস নিজেও জানতেন না। ভ্যাসিলিরা এসে পড়ায় সেদিন আর কথাবার্তা হয়নি। ওরা যদি ঘুণাক্ষরেও সোনিয়ার ইতিহাস জানত তাহলে তাকে পরদিনই ১১নং লুবিয়ান্‌কাতে অর্থাৎ মস্কোর ইলিসিয়াম রোতে 'চেকা' পুলিসের অতিথি হতে হ'ত।

পরের দিন সকালেই সরকারী হুকুমে আমায় চলে যেতে হল—একটা ছোট্ট শহরে গোপন খবর ফাঁস করবার জন্য। শুধু টেলিফোনে সোনাকে জানিয়ে যেতে পারলাম—আবার যেন দেখা হয়। বুকে তখন আসন্ন ঝড়ের আগমনী শুনতে পাচ্ছি। বাজছে গুরু গুরু ডমরু রব।

হ্যাঁ, আবার দেখা হয়েছিল বইকি। দিন সাতেকের মধ্যে হুকুম এল পত্রপাঠ ফিরে আসতে। ফিরবার পথেই দেখলাম জার সম্রাট্ রাজপাট ছেড়ে দিয়েছেন আর বিপ্লবীরা নতুন সরকার গড়ছে। আপিসে ছুটে এসে পৌঁছাতেই হুকুম পেলাম যে আমাদের এমব্যাসীর কয়েকটি মার্কামারা লোককে রাশিয়া থেকে বাইরে সরাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এখনি আমায় মোটর ভ্যানে উঠতে হবে। সময় পেলাম না। অনেক কাকুতি মিনতি করেও সময় পেলাম না একটি দিন পরে রওনা হবার। এমন কি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের দায়িত্বে থেকে যেতেও ওরা দিল না। বাকী সবার নিরাপত্তার জন্য আমাকে এ দেশ থেকে হঠাৎ এখনি চলে যেতে হবে।

বাইরে শত শত বছরের বাঁধ ভেঙে রাশিয়ার জনস্রোত বিপ্লবের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যে লাল চৌকায় (Red Square) আইভান দি টেরিব্‌ল্‌-এর সময় থেকে বলশেভিকদের মে দিবসের মিছিলের সময় পর্যন্ত হাজার অত্যাচার হয়েছে, সেখানে ক্রেমলিনের লাল রঙের উঁচু পাঁচিলের পাশে চল্লিশ হাজার বিপ্লবী সৈন্য নতুন পাওয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে মার্চ করে যেতে লাগল। তাদের পিছনে চলতে লাগল বিপ্লবের বাহিনী, ছাত্র, কেরানী, আইন-ব্যবসায়ী, শহুরে চিন্তাশীলের দল। সবাই তাদের টুপী উড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। বিজয় গৌরবে, আদর্শের সাফল্যে তাদের মুখ জ্বলজ্বল করছে। আমি কিন্তু প্রাণপণে চোখ মেলে চারদিক দেখছি, —কোথায় সোনা। সে যে আশ্বাস দিয়েছিল আবার তাড়াতাড়ি দেখা হবে।

হ্যাঁ, আবার দেখা হয়েছিল বইকি। বিপ্লবী বাহিনীর কুচকাওয়াজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—তাকে দেখতে পাবার আশা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—বুকের মধ্যে একটা অসহ্য বেদনা গুমরে

কেঁদে উঠছে,—এমন সময় আমারই ভ্যানের পাশে হঠাৎ সে বাহিনীর লাইন থমকে গেল। কে একজন হঠাৎ পড়ে গেল। তাকে পিছনের কয়েকজন তুলে ধরল, কিন্তু তার পা চলতে চাইছে না। বুঝলাম যে, হয় আমার নজরে পড়বার জন্য ইচ্ছা করে অথবা মানসিক উত্তেজনায় সে পা পিছলে পড়েছিল। তার সন্ধ্যাতারার মত দীপ্ত চোখছুটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পরেই মাটির মেয়ে সোনা তার মর্ত্যের স্বর্গের দিকে আবার মার্চ করে এগিয়ে যেতে লাগল। বুক ফেটে একটা ডাক বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু মুখ ফুটে তা বের হবার আগেই আমার সঙ্গীরা মুখ চেপে ধরল। নীরবে মুখ নীচু করে আমি বসে পড়লাম। আমার নিজের হৃদয়ের চেয়ে, আমার মানসী প্রতিমার চেয়ে আমার সহকর্মীদের নিরাপদে দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া অনেক বেশী জরুরী।

সেদিন মস্কোর আকাশে কিন্তু মেঘ বা বিদ্যুৎ কিছুই ছিল না। আসন্ন সন্ধ্যার সোনালী আলো লাল চৌকার লাল দেওয়ালের উপর পড়ে আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর ভল্‌গার জলের ধারার মত সোনার সোনালী চুলের রাশি সে আলোয় মার্চের তালে তালে ছুলতে ছুলতে জনতার মধ্যে শেষবারের মত মিলিয়ে গেল।

সন্ধ্যার মেঘ

১৯৪২ সাল।

বর্মায় ইংরেজ সৈন্যরা জাপানী আক্রমণ ঠেকাতে পারল না। জাপানীদের তাড়া খেয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে বর্মা ছেড়ে দলে দলে সৈন্য ও ভারতীয়রা বর্মা ও আসামের সীমান্তের দুর্গম পাহাড় টপকাতে টপকাতে অজানা পথে পালিয়ে আসতে লাগল। আমিও সেই দেশজোড়া প্রলয় স্রোতের মুখে একটি নামহারা আশ্রয়ছাড়া খড়কুটো।

বর্মা থেকে প্রথম যে সব দল পায়ে হেঁটে পালিয়ে এল, তাদের মধ্যে আমি ছিলাম। কোথায় ছিটকে গেল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। সংসারে যেন কেউ কারো নয়। প্রত্যেককে নিজের জন্যই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গৌহাটির কাছে পাণ্ডুতে ইংরেজ মহিলাদের চালানো বেসরকারী ক্যাম্প হাসপাতালে সাময়িক ভাবে নার্সের কাজ নিয়েছি। এখানকার এক রোগী বর্মা পালানো তড়িৎ রায়ের সঙ্গে সর্বদা দেখা করতে আসেন আরেকটি বর্মা পালানো তরুণী বরুণা সেন। হাসপাতালে বাইরের বন্ধু বা আত্মীয় যখন-তখন রোগীর কাছে আসা বা যখন-তখন অনেকক্ষণ কথা কওয়া সম্পূর্ণ মানা। তবু হাতের কাছে কোন ডাক্তার বা পর্যবেক্ষক নেই দেখে আমি ওদের অনেক কথা বলতে সুযোগ দিয়েছি। একটা বিরাট্ পৃথিবী জোড়া লড়াইয়ে সবই ছারখার হয়ে যাচ্ছে, আর আমি এই সামান্য নিয়মটুকু ভাঙতে পারব না?

নার্সের জীবনে অনেক ঘটনা হয়। তার চোখের সামনে তার চেয়েও বেশী ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। আজ যে ঘটনাটা ঘটে গেল

তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য কী যে হতে পারে তা আমিও ভেবে পাচ্ছি না। তড়িৎবাবুর পরিচয় ত শুধু ক্যাম্প হাসপাতালের রোগী হিসাবে। আর বরুণা সেনের পরিচয় তার 'ভিজিটার' হিসাবে। তাদের দুজনের মাঝখানে আমি কি করে কোথা থেকে এসে পড়লাম, তা নিজেই বুঝতে পারছি না। কিন্তু সে কাহিনীর ভার মন থেকে নামিয়ে ফেলতে না পারা পর্যন্ত শান্তিও নেই।

পাশাপাশি গাদাগাদি করে রোগীদের বিছানা। একজনকে সেবা করতে গেলে আর দুজনকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে যেতে হয়—এত 'ইভ্যাক্যুয়ি' রোগীর ভিড়। সংসার থেকে, পরিবার থেকে ছিটকে পড়া, বোমারু বিমানের হাত থেকে পালিয়ে আসা এই রোগীদের কেই বা দেখতে আসে? কারই বা মায়া আছে এদের উপর?

কিন্তু তড়িৎ রায়কে দেখতে একজন নয়, দু-দুজন লোক আসেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। এঁরা যে এখানকার লোক নন তা ত জানাই আছে। কিন্তু হৃদয় সেনের হৃদয় পড়ে আছে বহু দূরে, কলকাতায় বরুণাকে নিয়ে চলে যাবার দিকে। আর বরুণা বসে আছে ব্রহ্মপুত্রের দু পারের অতীত কালের নিশ্চল সাক্ষী ওই পাহাড়গুলির মত। হৃদয়ঘটিত ত্রিকোণের পুরোনো কাহিনী আজ নতুন করে এই হাসপাতালে অভিনীত হয়ে গেল।

আর আমি কি সেই ট্রায়াঙ্গেলের কোন একটা কোণ? অথবা ত্রিকোণকে চতুষ্কোণ করে তুলতে সাহায্য করলাম আজ?

ইভ্যাক্যুয়ি হাসপাতালে রোগীর সংখ্যার কোন ঠিক থাকে না। গত কদিন থেকে উত্তর আসামের দিক থেকে কোনো হাসপাতাল-ট্রেন আসেনি। বর্মা থেকে পলায়নের পালা প্রায় শেষ হয়ে এল। এদিকে নতুন আগন্তুকদের ঠাঁই করে দেবার জন্য পুরানো রোগীদের তিন দিন পর পরই দূরে অন্য হাসপাতালে চালান করে দেওয়া হচ্ছে। তড়িৎ

রায়েরও আজই এমন করে চালান হয়ে যাবার কথা ছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওর পায়ের তলায় জংলী কাঁটা ফুটে একটা পায়ের সমস্তটাই বিষাক্ত হয়ে গেছে।

ওর পায়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলে ডাক্তার ওকে আজ চালান যেতে দেননি। পা-টা যদি কেটে বাদ দিতে হয়, তাহলে সেটা এখানে করাই স্থবিধা হবে। ইতিমধ্যে তড়িৎ-বরুণার কাহিনীর পঞ্চমাঙ্ক আজই শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

ভোর হতে না হতেই হাজির হলেন হৃদয় সেন। চারদিকে বিশৃঙ্খলা। বহু রোগী এখান ছেড়ে যেতে চাইছে না। কামরূপ কামাখ্যার দেশে গৌহাটী শহরের কাছে আছে, তাই এতদিন পাহাড়ে জঙ্গলে ভয়ে ভয়ে সময় কাটানর পরে এ জায়গাতে ওরা শান্তি পেয়ে বসে আছে। অন্য কোথাও যেতে চায় না। অথচ যেতে হবেই। আবার অনেক আত্মীয়স্বজন রোগীদের ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। কি জানি আবার কোথায় নিয়ে যায়! অনেকে হাসপাতালে হাসপাতালে তাদের হারানো আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। উৎখাত মানুষ ঝড়ের মুখে ধুলোর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দিশেহারা হয়ে গেছে। এই ইংরেজ মহিলাদের চালানো স্বেচ্ছা-সেবক হাসপাতালেও আজ সকালে শৃঙ্খলা নেই একেবারে।

দূর থেকে দেখলাম হৃদয়বাবু জোরে চেপে ধরেছেন তড়িৎবাবুর হাত; দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, 'স্কাউন্‌ড্রেল, বিপদের মধ্যে পেয়ে পরস্ত্রী ভাগিয়ে নিয়ে এসেছেন! বর্মা-সুদ্ধ বাঙালী পাহাড় ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছে। তার মধ্যে কে পরস্ত্রী ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল, বলতে পারেন পরোপকারী স্বামীজী?'

তড়িৎবাবু সব সহ্য করেই উত্তর দিলেন, 'মাপ করবেন, বরুণা দেবীর স্বামী কে তা আমি কিছুই জানি নে। বর্মা থেকে একসঙ্গে,

একই দলে অবশ্য হেঁটে এসেছি। এ ছাড়া আর কোন ঘনিষ্ঠতাই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার হয়নি।'

'না, হয়নি! সাধু সাজা হচ্ছে!' মৃদু গর্জন করে উঠলেন হৃদয়বাবু।

তড়িৎবাবু পায়ের যন্ত্রণায় কাতরিয়ে উঠতেন হয়ত। তা না করে কোন রকমে মুখ চেপে বললেন, 'হৃদয়বাবু, আপনি ত ছিলেন কলকাতায়। সুখী অবস্থাপন্ন লোক। অমন বিপদে পড়ে যখন মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে বিপথে বেরিয়ে পড়ে, তখন সৌখীন প্রেম বা ঘনিষ্ঠতা করার মত মন আর সময় কোনটাই যে থাকে না, সে কথা আপনি বুঝবেন কি করে? আপনার স্ত্রী যে একা মান্দালে থেকে কি করে হেঁটে এসে আপনার কাছে পৌঁছেছেন, সে কথা একবার ভেবে দেখবেন।'

মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন হৃদয়বাবু, 'ওঃ, সহানুভূতিতে যে গদগদ একবারে!'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রোগী বললেন, 'দেখুন হৃদয়বাবু, আপনি বরুণা দেবীর স্বামী। ওর সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে পাশে দাঁড়াবার অধিকার শুধু আপনারই। কিন্তু হঠাৎ যদি একটা বিশ্ব বিপর্যয়ে দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা পায়ে হেঁটে, নদী সাঁতরিয়ে, ডাকাতদের ভাঁওতা দিয়ে, বর্মী গ্রামের গুণ্ডাদের হাত এড়িয়ে, আসামী পাহাড় ও জঙ্গল ভাঙতে ভাঙতে জীবনটা হাতে নিয়ে চলে আসতে হয়, তাহলে সেটা কি কেউ একা পারে? আর আপনার স্ত্রীর ত বয়েস-কম। না ছিল কোন আত্মীয়স্বজন, না সহায়সম্পদ। উনি যে এরকম বিপদের মধ্য দিয়ে চলে আসতে পেরেছেন সে জন্য নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান।'

একটু শান্ত হয়ে হৃদয়বাবু বললেন, 'সেই চলে যাবার কথাই ত

বলছি, মশাই। কিন্তু সে একেবারেই যাবে না, আপনাকে ছেড়ে সে যাবে না। কিছুতেই রাজী করাতে পারছি না।'

কথাবার্তা তৃতীয় পক্ষের পক্ষে খুব মুখরোচক সন্দেহ নেই। আমি, ক্যাম্প-হাসপাতালের ডাক্তার ও পরিচালক বাঘিনী মিসেস ওয়াকারের নজর এড়িয়ে তাঁবুর ঠিক ওপারেই কান পেতে বসে আছি। হাতে একটা ফিডিং কাপ, যেন এখুনি কোন রোগীকে জল খাওয়াবার জন্য নিয়ে এসেছি। শুনতে পেলাম, হৃদয়বাবু একটু থেমে ব্যঙ্গ মেশানো স্বরে বলে উঠলেন, 'পথের প্রেম !'

উত্তর শুনতে পেলাম তখনি, 'কেন আপনি এমনভাবে ভুল বুঝছেন হৃদয়বাবু ! পথের বিপদের মধ্যে পরস্পরের সাহায্য ও একসঙ্গে থাকার মধ্যে একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠলে তাকে প্রেম বলে মনে করে আপনি নিজেই কষ্ট পাচ্ছেন। এবং আপনার স্ত্রীকেও ভুল বুঝছেন। এ রকম করে ওঁকে ভুল বোঝার ফলে আপনি নিজেই সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করবেন। আমি আপনার স্ত্রীর প্রতি কোন প্রেমই অনুভব করিনি। শুধু আপনি ওঁকে নিয়ে বাড়ী চলে যান, এই চাই।'

'আপনি ত বললেন সে কথা'। ম্লান স্বরে পরাজিতের মত অসহায় গলায় বলে উঠলেন হৃদয়বাবু, 'আপনি ত বললেন সে কথা। কিন্তু কই, বরুণা ত তা মানে না। সে বলছে যে, বিপদের মধ্যে যে স্বামীর কর্তব্য করেছে, যে রক্ষা করেছে, নিজের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকায় নি, সেই মহাপ্রাণই ভালবাসার পাত্র। তাকে ছেড়ে সে যাবে না। আমি ত বলেছিলাম যে, বেশ ত তড়িৎবাবু সেরে উঠলেই আমরা চলে যাব। কিন্তু তাতেও সে রাজী নয়। সে আপনাকে আর কোন-দিনই ছেড়ে যাবে না।'

উত্তরে তড়িৎবাবু বললেন, 'সে ভার আমি নিজেই নিচ্ছি। আপনি

নিশ্চিত্ থাকতে পারেন যে, আমিই আপনাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাব।'

হু। কিন্তু আমি যে আজই ওকে নিয়ে যেতে চাই। বাড়ী থেকে সবাই ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে। গৌহাটিতেও যে কবে বোমা পড়বে তার ঠিক নেই। আমি এখন বাড়ীই বা যাই কি করে? বাড়ীতে লিখিই বা কি করে যে, বরুণা তার একজন বর্মার বন্ধুকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছে না। লোকেই বা কি বলবে এ সব শুনে!

ত। তা উনি কি বলছেন তাতে?

হু। উনি বলছেন যে, লোকনিন্দার জন্য ওর মাথাব্যথা নেই। জাপানী ও বর্মীদের হাত থেকে যে উদ্ধার পেয়ে ফিরে এসেছে, এটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তা যদি মনে করতে না পারি, তাহলে সে ফিরে আসতে পারেনি, একথা মনে করাই আমাদের উচিত। তড়িৎবাবু, আপনার কাছে আমরা সবাই খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন আপনি বরুণার মনকে মুক্তি দিন।

ত। মনকে বাঁধা বা ছাড়া কোনটাই করা যায় না। বিশ্বাস করুন আমি কোনটা করবার চেষ্টা করিনি।

হু। তবে ওকে বুঝিয়ে ঠিক করে দিন। আমরা আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই চলে যেতে চাই। মাথার উপরে বোমার ভয় নিয়ে আর থাকতে পারি না।

এই মেয়েটির সাহসের অন্ত নেই। চারদিকে সৈন্যদের তাঁবু পড়েছে। দেশী, আমেরিকান, নিগ্রো কত হরেক রকমের সৈন্য দৈত্যের মত আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। গৌহাটি শহরের মেয়েরাও রাস্তায় একা বের হয় না। আর এই মেয়েটি পাঁচ

মাইল দূরে পাণ্ডুতে সব সৈন্যদের ছাউনী এড়িয়ে এখানে হাসপাতালে রোজ হাজির হয় তড়িৎবাবুর সন্ধানে।

বুঝতে পারছি যে পঞ্চমাঙ্কের গতি খুব দ্রুত হবে। হৃদয়বাবু এই মাত্র মিনিট পনর হল এখান থেকে চলে গেছেন। এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয়ই এর মধ্যে দেখা বা কোন কথা হয়নি। অদম্য কৌতূহলে আবার এসে তাঁবুর ওপরে কান পাতলুম। শুধু মিসেস ওয়াকার বেঁটে ছাতা হাতে খুটখুট করে এদিকে এসে হাজির না হলেই হল।

তড়িৎবাবু বরুণা দেবীকে বোঝালেন, ‘বরুণা, তুমি ভুলে যাও—সব ভুলে যাও। এই ক’টা মাস ছিল দুঃস্বপ্ন। আমিও সেই দুঃস্বপ্নের একটা ছোট্ট টুকরো। এখন তুমি স্বামীর সঙ্গে ফিরে গিয়ে সুখী হও!’

সে মেয়েই বরুণা নয়। সে বলল, ‘আমার মন খুব ঠিক আছে। আমি আমার মনকে জানি। আমার নব জন্ম হয়েছে। নতুন পৃথিবী তৈরী হয়ে গেছে আমার। আমি আর স্বামীর কাছে ফিরে যাব না। সে সংসার আমার আর নেই।’

ত। ছি ছি, এ কথা বলো না, বরুণা। তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসেন।

ব। তুমিও ত আমায় ভালবাস।

ত। না, সে ভালবাসার কথা থাক। পথের পাশে তার জন্ম। পথের পাশে তাকে ফেলে দিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও।

ব। ঘর ত আমার পর হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আমার কাছে ঘর কোন বড় কথা নয়। দুঃখের মধ্যে—দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমি অমৃত পেয়েছি। তা আমি ছেড়ে যেতে পারব না। তুমি আমায় এমন কথা বলো না।

ত। তখন আমাদের কোন উপায় ছিল না। দিনের পর দিন অজানা পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে আসতে গেলে শুধু শরীর ঠিক রাখলেই ত সব হয় না। মনকেও শক্ত রাখতে হয়। দেখলাম তুমি খুব ভেঙে পড়েছ। আর, পড়বার ত কথাই। মনিয়াতে ডাকাত-গুলো যেভাবে তাড়া করেছিল, তার কথা ভাবতেও এখনো ভয় করে। জাপানী বোমারু বিমান যদি তখন হানা না দিত, আমরা ডাকাত-গুলোর হাত থেকে উদ্ধার কিছুতেই পেতাম না। এমন করে যাদের চলতে হয়েছে, তাদের মনে একটু একটু করে নেশার প্রয়োজন হয়। এই ধরো, যেমন ইংরেজরা সন্ধ্যাবেলা একটু মদ খায় আর সারা সন্ধ্যা খোশ মেজাজে থাকে।

ব। ছি ছি, তুমি একে নেশার সঙ্গে তুলনা করলে! আজ বুঝি তোমার পায়ের ব্যথা খুব বেড়ে গেছে?

বরুণার গলায় উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে—তাঁবুর ওপার থেকেও তা বেশ বুঝতে পারলাম।

ত। না, না, কোন ব্যথার জন্য এ কথা বলছি না। ভেবে দেখ সে দিনগুলোর কথা। সারা দিন পাহাড় বেয়ে উঠছি। জল তেষ্টায় তুমি অস্থির হয়ে পড়লে। আমি অনেক খুঁজে একটা পাহাড়ী ঝরনা বের করলাম। বললাম, আমি নীচে নেমে জল তুলে নিয়ে আসি। তুমি রাজী হলে না। আমরা দু'জনেই গেলাম, কিন্তু জল খাওয়া হল না। ঝরনার উপর উপুড় হয়ে পড়ে মরে আছে একটি ছোট্ট ছেলে। বেচারা তেষ্টায় আকুল হয়ে উপুড় হয়ে জল খেতে গিয়ে মারা গেছে।

ব। আহা বেচারী! তার কথা মনে করিয়ে দিয়ো না।

ত। না, তার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি না। মনে করাচ্ছি তোমার কথা। তুমি তার পর থেকে এরকম ভাবে ভেঙে পড়লে যে,

তখন একটু নেশা না হলে আর চলতে পারতে না। সে নেশাই তোমাকে দিয়েছিলাম।

ব। আজ তুমি তাকে নেশা বলছ! হয়ত এবার ভালবাসা জিনিসটাকেই নেশা বলবে।

ত। দেখ, যার একটা পা হাসপাতালে কেটে ফেলে দিতে হবে, এমন রোগীর এ সব আলোচনার মানে হয় না। কিন্তু এ কথা ত সত্যি যে, সব ভালবাসাই নেশা। তবে শ্যাম্পেন আর ধেনোতে তফাত আছে বইকি। আমরা বড় জোর জাপানী সাকুরা চেখেছিলাম —এ কথা মনে করে নাও।

ব। দেখ, অস্ট্রিয়াতে ইম্পিরিয়াল টোকেই ব'লে সবচেয়ে বনেদী একটা মদ আছে বলে শুনেছি। টোকিওর তাড়া খেয়ে পথে বের হয়ে আমরা সেই টোকেই পান করেছি প্রাণ ভরে। আমি এর পর আর সাংসারিক ধেনোতে ফিরে যেতে রাজী নই। এই আমার শেষ কথা।

তড়িৎ এ কথায় না হেসে থাকতে পারল না। বলল, 'আমি জানি বরুণা, বারুণীর প্রভাব তোমার মনে এসে পড়ছে। কিন্তু এ কথা ত জান যে, জীবনের তেষ্টা নেশায় মেটে না, তার জন্য চাই সাদা সহজ জল। এমন কি 'ডিস্‌টিলড ওয়াটারে'ও চলবে না।'

ব। কিন্তু তৃষা যাতে মেটে, তাকে তুমি নেশা বল কি করে?

ত। শোনো বরুণা, ভুল করো না। এ নেশা হচ্ছে সর্বনাশা। তুমি আমার কথা ভুলে যেয়ো। ভুলে যেয়ো বর্মা-আসাম প্রান্তের দুঃস্বপ্ন। না হলে কখনো সুখী হতে পারবে না।

ব। চাই না আমি তোমায় ছেড়ে সুখী হতে। আমার জন্য তুমি কি না করেছ! আজ ত বললে চলবে না যে, শুধু আমায় সাহস দেবার জন্য তুমি ওসব করেছ। তোমার হাত যখন আমার হাত ধরে

টেনে পাহাড়ে চড়াই বয়ে চলেছে তখন কি তুমি আমার মনকেও ধরে টাননি? তুমি কি শুধু সুদূর দিগন্তে 'পাটকাই বুম' গিরিমালার শেষ চূড়োটাই খুঁজতে তোমার ব্যাকুল চোখ দিয়ে? সে চোখ কি আমার মনে আগুন জ্বালবার জন্য বিহ্বলতার শিখা মেলে তাকাত না? আজ তুমি সংসারের কথা ভাবছ, তাই এসব কথা বলছ। কিন্তু সংসার আমার নেই।

তড়িৎ হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, 'দোহাই তোমার, বরুণা একথা বোলো না। তোমার সংসার আছে, স্বামী আছে। সবাই আদর করে তোমায় ডাকছে।'

বরুণা উত্তর দিল, 'সবই আছে, শুধু তুমি নেই। এই কথা তুমি আমায় আজ বোঝাতে চাও!'

ভারী ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা পায়ের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে তড়িৎ বলল, 'সত্যিই আমি নেই। ডাক্তার সেপ্‌টিক থেকে বাকী শরীরটা বাঁচাবার জন্য এই পা-টা আজ বাদ দিয়ে দেবে। তার পর যদি বেঁচেও থাকি, সে ত আর আমি থাকব না! অন্ততঃ এজন্যও ত আমায় তুমি ভুলে যেতে পার।'

বরুণা এ যুক্তি শুনে প্রায় ক্ষেপে উঠল। বলল, 'অর্থাৎ তুমি আমায় কাপুরুষ ও স্বার্থপর ভেবেছ। জেনে রেখো, যদি বা কখনো তোমায় ছেড়ে যেতে পারতাম, যে আমায় এত বিপদে রক্ষা করে এনেছে, তাকে আমি অসহায় অবস্থায় কখনো ছেড়ে যাব না।'

'তোমার সহানুভূতি নিয়ে তোমার উপর বোঝা হয়ে থাকব, এই কি তুমি চাও?' প্রশ্ন করল তড়িৎ। তার চোখ দুটি এক দৃষ্টে বরুণার দিকে চেয়ে রইল।

আড়াল থেকে, আমার হৃদয় দুরু দুরু করে উঠল বরুণার উত্তর শুনবার জন্য।

বরুণার দুটি ঠোঁট কি কেঁপে উঠল সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ?

অনেকক্ষণ কোন কথা শুনতে পেলাম না তাঁবুর ওপার থেকে। সম্ভবত ভাষা যেখানে স্তব্ধ হয়ে গেল, ভাব সেখানে সব ভরিয়ে দিচ্ছিল। মোট কথা খানিকক্ষণ আর কিছুই শুনতে পেলাম না।

খানিকক্ষণ অন্যদিকে ডিউটি সেরে আসতে হল। বরুণা সেন যে কখন চলে গেছে, তা কিছুই জানতে পারিনি। তবে জানি যে, নিশ্চয়ই আবার এসে হাজির হবেন—হয় তিনি, না হয় তাঁর স্বামী। জীবনের অভিনয় হচ্ছে যে মঞ্চে, সে মঞ্চ খালি থাকবে না নিশ্চয়ই।

বিকেলের দিকে ডাক্তার এসে তড়িৎ রায়কে খানিকক্ষণের জন্য চাকায়চড়ান ঠেলা বিছানায় বাহিরে গাছের তলায় নিয়ে রাখতে বললেন। ততক্ষণ তাঁবুগুলির ভিতরে বীজাণু শোধন করা হবে। কালই আবার নতুন একদল রোগী আসবার কথা। ডাক্তার বলে দিলেন যে, রায়কে যেন চোখে চোখে রাখি। হঠাৎ চেপে জ্বর এলে তাড়াতাড়ি খবর দিতে হবে।

একটা গাছতলায় নদীর পারে খোলা আকাশের তলায় জ্যৈষ্ঠ মাসের মাতাল করা বিকেলে তড়িৎ রায় আধো শুয়ে রয়েছেন। কাছে আর কেউ নেই—যদিও অল্প দূরেই লোকের চেঁচামেচি ও হৈ-হুল্লোড়ের অন্ত নেই। এমন সময় দেখতে পেলাম শ্রীমতী বরুণা সেনের পরিচিত মূর্তি। প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে তিনি একেবারে রোগীর বিছানার কাছে এসে ওষুধ রাখার টেবিলটার উপর আলগোছে বসলেন। বুঝলাম যে, আমি কাছে আছি বলে, অথবা বিছানায় বসলে রোগীর পায়ে লাগতে পারে বলে তিনি সেখানে বসলেন না।

একটু দূরে সরে এলাম। বেশী দূরে নয়। ডাক্তারের বারণ আছে। কিন্তু কথাবার্তা যতটা দূর পর্যন্ত বাতাসে ভেসে আসতে পারে, তার মধ্যেই রইলাম। মনে বুঝেছি, পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্য এখনি অভিনীত হবে। ওদের প্রেম কি আমার মনেও একটু আধটু ঢেউ তুলতে আরম্ভ করেছে? মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে।

ব্রহ্মপুত্রের জল খুব বেড়ে উঠেছে এই ক'দিনে। লোকে বলছে যে, হিমালয়ের কোলে বরফের নদীগুলি গলতে শুরু হয়েছে; তাই বর্ষা তেমন আরম্ভ না হলেও নদীর বুকে জল ফুলে উঠেছে। তেমনিভাবে ফুলে উঠেছে তড়িৎ বরুণার দুটি আসন্ন বিচ্ছেদের ভয়ে ব্যাকুল হৃদয়। তেমনি ভাবে উপচিয়ে উঠেছে আমার সহানুভূতিভরা কৌতূহল।

সুখী হোক, যেমন করে হোক সুখী হোক এরা—শুধু এই মনে মনে চাচ্ছি। আমার ত স্বামী নেই, সংসার নেই। বিরাট্ ব্রহ্মপুত্রের বুকে অসহায়ভাবে ভেসে যাওয়া শৈবালদল আমি, ভেসেই চলে যাব। শুধু পারে যে তরুলতা কোনরকমে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারা যেন বর্ষার স্রোতের টানে শিকড় ছিঁড়ে ভেসে না যায়।

তড়িৎই আগ্রহভরে বলে উঠল, 'যাক্, তুমি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছ ত? তোমাদের ট্রেন ত আর মাত্র দু-ঘণ্টা পরেই। বেশ, বেশ খুব ভাল হল।'

বরুণা খুব দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'না। আমি যাব না ঠিক করেছি। আমার স্বামীকে বলে এসেছি—তিনি যেতে পারেন, কিন্তু আমি ফিরব না।'

ত। কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে কি করে? আমি ত কালই 'সার্জারি'র মধ্যে যাব। যখন ফিরে আসব, তখন এ পৃথিবীতে আমি নাও থাকতে পারি। আর যদি বা থাকি, তোমার সহানুভূতির আর

সকলের দয়ার পাত্র হয়ে কারো গলায় ঝুলে আমি থাকতে পারব না। তুমি যদি আমায় ভালবেসে থাক, আমায় দয়া করে ছেড়ে যাও। অঙ্গহীন ভিখারীকে তুমি দেখতে চেয়ো না।

কাতর কণ্ঠে বরুণা বলল, 'না, না, আমায় ছেড়ে যেতে বোলো না। যখন আমাকে তোমার সবচেয়ে বেশী দরকার, তখনই আমায় এমন করে দূরে ঠেলে দিয়ো না। আমি তোমার সঙ্গে থাকব আজীবন। আমায় তুমি যেমন ভাবে নিজের সংসারে রাখতে, ঠিক তেমনি করে তোমায় রাখব আমার সংসারে। তোমার ত একটা অবলম্বনও দরকার হবে।'

খুব শক্ত ভাবে তড়িৎ বলল, 'সে বন্দোবস্তও আমি ভেবে রেখেছি। নিঃস্ব, অঙ্গহীন হয়ে আমি তোমায় ভর করব না। যাকে ভালবাসব, তার বোঝা হয়ে দাঁড়াব না।'

তার কথা শেষ হবার আগেই বরুণা বলল, 'না, না, তুমি কেন বোঝা হবে আমার? তোমাকে ত—'

কথা শেষ করতে দিল না তড়িৎ। সে বলে উঠল, 'বোঝা ত নিশ্চয়ই, তুমি যতই আমাকে অন্যরকম বোঝাতে চেষ্টা কর। শোন, গোলমাল কোরো না। তোমার প্রেম হচ্ছে বনকুসুম। তাকে উদ্যানলতা করে তুলতে গেলে তার না থাকবে রস, না থাকবে রূপ। তুমি দিয়ে গেলে আমায় গোপন প্রেম। হ্যাঁ, আমি আর অস্বীকার করব না—তুমি আমার গোপন প্রণয়িনী। মনে-মনেই তুমি থাকবে তা হয়ে। সংসার তাকে স্বীকার করবে না, স্বামিত্বের সম্মান দেবে না। সেটুকু মেনে নিয়ে তুমি চলে যাও।'

আর্তকণ্ঠে বরুণা বললে, 'না, না, তোমায় ছেড়ে যাব না। সংসার স্বীকার না করলে কি-ই বা আসে যায় আমার?'

'না, অনেক আসে যায়', বলল তড়িৎ, 'আমার দরকার হবে

সংসারের কাছে অনেক সহায়তা, অনেক সহানুভূতি। আমি চাই রক্ষক স্ত্রী—স্ত্রীকে খাওয়াতে পরাতে আমি পারব না।'

বরুণা বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি যা চাও, তার সবই আমি হতে পারব। তুমি একটি বার রাজী হয়ে যাও।'

নিষ্ঠুর একটা হাসি মুখে টেনে এনে তড়িৎ বলল, 'না, না, তা হয় না বরুণা। তুমি নিশ্চয়ই চলে যাবে। তোমাকে যেতেই হবে। সংসারে আমার যা চাই, তা আমি বেছে নিয়েছি। এই দেখ তার প্রমাণ।'

তড়িৎ রায়, বর্মা থেকে সংসার থেকে উপড়ানো, আমার কাছে একেবারে অজানা তড়িৎ রায় হঠাৎ খুব মধুর স্বরে ডেকে বসলেন। আমি চমকে উঠে ওঁর ডাকের উত্তরে বিছানার খুব কাছে এসে দাঁড়ালাম। সহানুভূতিতে আমার দুটি চোখ ছল ছল করছে, বুক ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—সে কি রোগীর কষ্টের জন্য নার্সের সহজাত মমতা, না এই বুকভাঙা কাহিনীর জন্য করুণা!

কি জানি? শুধু এইটুকু জানি যে, তড়িৎ রায় যখন আমাকে তার ভাবী স্ত্রী ও রক্ষক বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন, বললেন যে এই হাসপাতালে থাকতে থাকতেই তাঁর প্রতি সমবেদনায় ব্যথিত হয়ে আমি তাঁর ভবিষ্যতের সব ভার তুলে নিতে রাজী হয়েছি এবং তিনিও তাঁর ইহজীবনের ভার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—হঠাৎ যেন কি হল! আমি সে সব কথার একটারও প্রতিবাদ করতে পারলাম না। শুধু শুনে যেতে লাগলাম।

একটু পরে বরুণার যেন চৈতন্য ফিরে এল। সে বেচারী এরকম একটা অদ্ভুত ও অসম্ভব ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কি বলবে কিছুই বুঝতে না পেরে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তাকিয়ে রইল রক্তশূন্য মুখে রক্তসূর্যে রাঙিয়ে দেওয়া ওপারের মেঘরাশির দিকে।

অনন্ত কালস্রোত পায়ের কাছ দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের সঙ্গে বন্যার মত বেগে ভেসে চলে যাচ্ছে। তড়িৎ, বরুণা, হৃদয়, আমি সবাই ত এই স্রোতের পারে দাঁড়িয়ে আছি সামান্য লতার মত। কোথায় কখন ভেসে যাব তার স্থির নেই। সে স্রোত এই ত এখনি বরুণাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তড়িতের কাছ থেকে। কাল তড়িৎ নিজেই এমন সময় কোথায় ভেসে যাবে তার ঠিক নেই।

আর আমি? আমি ত শুধু ওই সন্ধ্যার মেঘ। আকাশ আর পৃথিবীর প্রণয়ের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করবার জন্য ভেসে এসেছি ক্ষণিকের জন্য।

একটা কথাও মুখ ফুটে বলতে পারলাম না তখন। একবারও বলতে পারলাম না যে, ওদের দু'জনের একান্ত নিজেদের জীবনের মাঝখানে আড়াল তৈরি করবার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি আমাকে কেন ক্ষণিক মিথ্যার জালে জড়ান হচ্ছে? এ খুব অস্বাভাবিক অত্যাচার। কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাব দেখিয়েই আমি সব কথা মেনে নিলাম। মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে লজ্জাবতী লতার মত মুখ নীচু করে রইলাম।

তারপর যেন কোন কথাই আর কানে এলো না। কখন যে বরুণা সেন বিদায় নিয়ে গেলেন, তাও ঠিক লক্ষ্য করতে পারলাম না। আমি ওদের প্রত্যেকটি কথা শুনবার জন্য বার বার আড়ালে থেকে লুকিয়ে থাকতাম। কিন্তু আজ একটা মিথ্যা অভিনয়ের আবেশে দিশেহারা হয়ে রইলাম। ওদের বিদায়কালের কথাবার্তা একটুও কানের মধ্যে ঢুকল না। সে মিথ্যার পাপ পুণ্য বিচার করে দেখবার মত মনও আমার ছিল না। শুধু চোখ আমার দেখছিল পাণ্ডুর ওপারে পাহাড়ের উপর সন্ধ্যার মেঘগুলিকে। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ শ্যামল পাহাড়-গুলির উপরে জমা হয়ে রয়েছে। কিন্তু বরুণার প্রেমরাগের আলো তড়িৎ রায়ের জীবনের উপর এসে পড়ে তাকে আর আলোময়

করবে না। কাল সকালে তড়িৎ রায়ের জীবনে যে দিন আসবে, তার মধ্যে কোন আলো থাকবে কিনা জানি না। আর আমি? আমি ত শুধু সন্ধ্যার মেঘ।

পাণ্ডুর ওপারে পাহাড়গুলির উপর দিয়ে মেঘের আড়ালে এমন করুণ সূর্যাস্ত আর কখনো হয়নি।

নিশাস্বপ্ন

প্রেমের মধ্যে আমি আর নেই।

অবশ্য আমি যে প্রেমে পড়েছিলাম তা নয়। অথবা আমার প্রেমে যে কেউ পড়েছিল তা-ও নয়।

যে নিষুতি-রাতের কাহিনী এটা, সেটা প্রেমের জন্য তৈরী হয়েই ছিল। এমন একটি রাত, যার ডাককে ঠেকান যায় না। মনে হচ্ছিল যেন পূর্ণিমার আলো অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কাহিনীকে আবার ঘটাবার জন্য আকাশ থেকে নেমে এসেছে। চিত্রাঙ্গদা বর চেয়েছিলেন যে তার এক বছর ছলনার শেষ রাতটি যেন সবচেয়ে বেশী মধুর হয়ে বসন্তের শোভা দিয়ে তাকে সাজিয়ে দেয়। অর্জুনের হৃদয় যেন শেষবারের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে হরণ করতে পারেন। আজ রাত্রিতে মনে হচ্ছে যে বহু আধুনিক অর্জুনের মন ভেনিসের চিত্রাঙ্গদারা— আহা, রুজ-লিপস্টিক-পাউডারে চিত্রিত অঙ্গ তাদের—হেলায় হরণ করবে।

আমার হোটেলের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সারি সারি সাইপ্রেস গাছের আড়ালে আলোছায়ার মায়াজাল রচিত হয়েছে। ব্রুনোর ভাষায় সাদা আর কালোতে যে ছবি তৈরী হয়, সে ছবিই সবচেয়ে সুন্দর। তার প্রমাণ দক্ষিণ ইটালীর সুন্দরীদের কালো আঁখি। শ্বেত মার্বেল পাথরের গড়া মূর্তির মধ্যে কালো আঁখিই সবচেয়ে বেশী মনকে টানে। সে বলে যে, আমাদের দেশের কৃষ্ণকলিদের কালো কাজল চোখের রূপ তেমন খোলে না, তারা ইটালিয়ান মেয়েদের গায়ের রঙ পায়নি বলে। ব্রুনো পৃথিবীর কোথায় যে না ঘুরেছে তার ঠিক নেই।

মোট কথা, এই মায়া আমার মনকে সামনের আলোয় আলোময় পথে টেনে আনছিল। ঘরে থাকতে দিচ্ছিল না। এমন চাঁদনী রাত্রি শুধু কবি, প্রেমিক ও পাগলদেরই পথে টেনে আনে। তা ছাড়া আর যাদের টেনে আনে তাদেরও এই তিন শ্রেণীর কোন না কোনটাতে ভিড়িয়ে দেয়।

এমন রাতটিতে হোটেলের রেস্তোরাঁ-ঘরে বসে আদব-কায়দা মাফিক গুনে গুনে ঠিকমত ছুরী কাঁটা চামচ চালিয়ে "অন্ত রজনীর ফরাসী স্পেশিয়ালিটি" খাবারগুলির সদ্গতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পথ আমায় ডেকেছে। বাগানের পথে ঝাউকুঞ্জের পাশে পাশে পাথরের মূর্তিগুলিও আমায় ডেকেছে।

ওই পথ অবশ্য কাউকে রোমে নিয়ে যেতে পারবে না—যদিও ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে, সব রাস্তাই রোমে নিয়ে যায়। দুধারে বাগান ও পুরোনো ইতিহাসের গন্ধমাখানো বাড়ী। তার মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে যেতে যেতে হাজির হলাম ভেনিসের জলপথে। এই "গ্রাণ্ড ক্যানালেই" এই পথের শেষ, আর আমার গল্পেরও এখানে আরম্ভ।

সারাটা দিন আমার খুব বড়লোকী ভাবে কেটেছে অর্থাৎ আমার পকেট গড়ের মাঠ। অতীতের রাজা-উজীর গোছের 'ডোজের' প্রাসাদের সুন্দর ছবিগুলির সামনে আমার সারা দিন কেটে গেছে। আমার চারপাশে তড়ি-ঘড়ি ঘোরা ফেরা করে গেছে কোটিপতি আমেরিকান টুরিস্টরা। তাদের যে মাত্র একদিনের মেয়াদ ভেনিসে। এক মাসে গোটা দুনিয়া সেরে যেতে হবে তাদের। আবার বইয়ে লিখেছে যে "টু সি ভেনিস য়্যাণ্ড দেন ডাই" অর্থাৎ ভেনিস না দেখে মরলে সেটা আমেরিকান টুরিস্ট শাস্ত্র অনুসারে মরাই হবে না।

আমি কিন্তু মজে গেলাম ইটালিয়ান ছবিগুলির রঙের খেলায়।

এমন নানা রঙ মেশানো রূপ শুধু ছবিতেই নয়, ইটালীর আকাশে— ভেনিসের সাগরস্নানের জায়গা 'লিডো'র জলে আর লীলাচঞ্চল ইটালিয়ান আঁখিতে ছড়িয়ে পড়েছে। তার রঙের পরশ মায়া বুলিয়ে দিয়েছে আমার মনে। সেই রঙই হাতছানি দিয়ে পথে টেনে এনেছে আজ নিষুতি রাতে।

ভেনিসের সাজান গোছান নৌকাগুলিকে গণ্ডোলা বলে। গাঙে দোলা খেতে খেতে ভেসে যায় বলেই বোধ হয় নাম হয়েছে গণ্ডোলা। ইঞ্জিনে-চালান গণ্ডোলায় আমি কোনদিন চড়তে পারলাম না। সোনার পাথরবাটিতে খেয়ে আপনারই কি আর তৃপ্তি হয়? হাতে-বাওয়া ছোট আমার পান্‌সী তরীখানি বেয়ে 'রিয়াল্‌টো' সাঁকোর তলায় এসে নামলাম।

আমি টুরিস্ট হলেও ওই দলটাকে পছন্দ করি না। তাই ছোট্ট একটি পথের কোণার রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকলাম। আমি যে বিদেশী। আমার বিদেশী মনকে স্বদেশী আবহাওয়ায় একেবারে ঢেলে দিতে চাই। তার সঠিক পরিচয় চাই। এ সব জায়গায় এলে খাঁটি ইটালিয়ানকে পাওয়া যাবে। সে আমায় আমেরিকান টুরিস্টের নাক-উঁচু চাউনি হেনে নীরবে শুধোবে না: 'তুমি কে বট হে?'

একটু একটু করে খেতে খেতে চোখ প্রায় বুজে এসেছিল। কারণ মন খুলে গিয়েছিল একটি ভিখারীর 'ম্যাণ্ডোলিন' বাজনা শুনতে শুনতে। সে খুব পুরোনো একটি দক্ষিণী সুর বাজাচ্ছিল। সে সুর আমার সারা দিন ও সারা সন্ধ্যার ঘুরে বেড়ানর সঙ্গে মিশ খেয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে ওলট-পালট লেগে গেল। যে সার্থকতা এই সব সাধারণ ইটালিয়ানের জীবনে নেই, যে অস্তিত্বের কথা এরা ভাবে না স্বপ্নেও, সেই গৌরব যেন এদের আছে বলে মনে হতে

লাগল। চোখ বুজে বেঁচে থাকার আরাম চাখছি এমন সময়ে খুব মৃদু একটা শব্দে চোখ মেলে দেখলাম—সামনে এসে বসেছে একটি মাঝবয়সী ইটালিয়ান। চোখে সহানুভূতি, আর মুখে প্রসন্নতা। সর্বাঙ্গে গতযৌবন এক সুপুরুষের আভাস এখনো একেবারে মিলিয়ে যায়নি।

'সিনর, মাপ করবেন, কিন্তু আমায় বন্ধুভাবে নিয়ে আমার দোষ মার্জনা করবেন। মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় কিছু ভাবছেন। কারো কথা বোধ হয় ভাবছেন।'

লোকটি বলে কি? বড় লজ্জা করতে লাগল। সত্যিই ত মামুলী সস্তা একটা রেস্তোরাঁয় বসে খেতে খেতে চোখ বুজে এলে লোকে কি ভাবতে পারে? মুখে বোধ হয় একটু অপ্রস্তুতের হাসি ফুটে উঠল।

ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিকই বুঝেছি, সিনর, আপনি কারো কথা ভাবছেন। এমন রাতে সেটা খুবই স্বাভাবিক।'

সহানুভূতিতে তার স্বর একটু মোলায়েম, চোখ একটু কোমল হয়ে এল। তিনি বললেন, 'আপনি যার কথা ভাবছেন তিনিও নিশ্চয়ই আপনার কথা এখন, এই মুহূর্তেই ভাবছেন।'

কি সর্বনাশ! অর্থাৎ এ বলতে চায় যে আমি প্রেমে পড়েছি? অবশ্য সারা দিন ঘোরাঘুরির পরে আমার মাথার চুল একটু এলোমেলো হয়ে পড়েছে। ঠিক তরুণ কবিদের মত। ভেনিসের আকাশের ও 'লিডো'র সুনীল রঙের আঁকাবাঁকা খেলার সঙ্গে 'ম্যাচ' করে একটা টাই আমার গলায় পরা রয়েছে। কিন্তু তাতেই কি প্রেমে পড়ার কোন নিশানা পাওয়া যায়?

মুশকিলে পড়ে আবার একটু হাসলাম। সামনের প্লেটটাতে পরম সুখাদ্য 'এস্কালপ' (অনেকটা কাটলেট গোছের) ও ম্যাকারোনি

য়্যাল পোমাদোরো (টোমাটো 'রসে' মাখান ম্যাকারোনি) এখনো বাকী রয়েছে। আনমনে প্লেটটা একটু সরিয়ে রাখলাম।

ভদ্রলোক বোধ হয় এতে আমার দিক থেকে একটু সায় পেলেন। চেয়ারটা একটু কাছে টেনে এনে চাপা গলায় বললেন, 'আমি দুঃখিত যে আপনার স্বপ্ন ভেঙে দিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভেবেছিলাম যে আমি একজন সমব্যথীর সন্ধান পেয়েছি। কেন এমন হল জানি না, কিন্তু জানেন তো যারা একই কথা ভাবে তারা পরস্পরকে চিনতে পারে। অবশ্য আপনার স্বপ্ন গড়ে উঠছে, আর আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। আজই···এইখানে···এই রেস্তোরাঁতে—'

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। আমি ত কোন স্বপ্ন এখনো দেখতে শুরু করিনি। অবশ্য যদি করতাম, আমার বাইশ বছর বয়সকে দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু এর মিষ্টি আন্দাজকে ভেঙে লাভ নেই। এর জীবনে যা ভেঙেছে, আমার সম্বন্ধে একটা কল্পিত অনুমান তার তুলনায় অতি সামান্য। তাই আমার মন গলে গেল। ভারী গলায় বললাম, ভেঙে গেল ! আপনার আশাস্বপ্ন ভেঙে গেল ? আহা—'

ভাবাবেগে আর কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু আমার চোখদুটিতে প্রশ্ন মাখান রইল।

ভ। সত্যি। কেন যে দেশে ফিরে এলাম এত বছর পরে, আমি জানি না। আর দেশের চেনা লোকদের মধ্যে আমার ফিরে আসা যেন জানাজানি না হয়ে যায়, তাই আমি শীগ্‌গির আবার চলে যাব।

আ। বিদেশে চলে যাবেন ? বিদেশে ? আবার প্রবাসী হবেন ?

কথাটা বলেই মনে পড়ে গেল যে, তিন বছর ধরে আমিও প্রবাসী।

ভ। কেন হব না? দেশে আমার রইল কি? যাকে নিয়ে দেশ, আমার দেশের স্বপ্ন—সে ত আর 'সে' নেই। শুধু আমিই এক সে-ই আছি।

এই রেস্তোরাঁতে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বলেছিলেন, তাই ঘরটার চারদিকে চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। শুধু একটি নারী আছে সেখানে। এই রেস্তোরাঁরই মালিক, যৌবনে সবে ভাটা পড়ে এসেছে, কিন্তু এককালে সুন্দরী ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য ইটালীতে কেই বা সুন্দর নয়, এ প্রশ্ন একবার মনে যে না উঠল তা নয়।

আমার নজর লক্ষ্য করে প্রৌঢ়ও চারদিকে তাকিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরও নজর ওই নারীতে এসে শেষ হল। রেস্তোরাঁওয়ালীর চোখের ভুরু দুটি একটু চাপা হাসির আভাস দিয়ে রামধনুর মত বেঁকে খেলে গেল। ভদ্রলোকও মৃদু ভ্রূভঙ্গী করলেন। দু'জনে যে খুব চেনা পরিচয় আছে তা সহজেই বুঝতে পারা গেল। ভাবলাম, হায়, কত কাছে এরা, অথচ কত দূরে!

ভ। জান বন্ধু, ওই হচ্ছে আমার অতীতের প্রিয়া। যে অতীত আমার কাছে এই আজ পর্যন্ত সত্য হয়ে বর্তমান ছিল। আমার আর এখানে মন টিঁকছে না। চলো, আমরা বাইরে কোথাও চলে যাই।

আবার সেই নারীর দিকে তাকালাম। তার অধরে—যে অধর এই ভদ্রলোকের জন্য ধরাতে স্বর্গ রচেছিল—সে অধরের কোণে একটু হাসি লেগে আছে। আমরা দু'জনে বাইরে চলে এলাম। গণ্ডোলা ঘাটেই বাঁধা ছিল।

ততক্ষণে 'সান মার্কো' গীর্জার সুন্দর চত্বর খালি হয়ে গেছে। কিন্তু জ্যোৎস্নায় ভরে আছে সে জায়গাটা। প্রায় সমুদ্রের মত জল

সেখানটাতে। তার উপর জ্যোৎস্না পড়ে আনন্দে কুটি কুটি হয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। জলের ধারে এসে দু'জনে বসলাম।

ব্রুনো বলে যেতে লাগল তার কাহিনী। আমরা ততক্ষণে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসে পৌঁছিয়েছি। সে বলে যেতে লাগল —বড়লোক অফিসারের মেয়ের সঙ্গে এক গরীবের ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী।

ব্রু। ক্লারেট্টা ফরাসী 'ক্লারেট' মদের মতই আমার সমস্ত জীবনকে মাতিয়ে রেখেছিল। আঙুর থেকে ক্লারেট নিংড়ে বের করা হয়। তেমনি গোছা গোছা আঙুরের মত কোঁকড়ান চুল ঘিরে থাকত তার মুখখানাকে। সে মুখসুধা আঙুরের মত নিংড়িয়ে নিংড়িয়ে পান করতে ইচ্ছা হত, কিন্তু আমরা হচ্ছি রোম্যান ক্যাথলিক।

আ। তাতে লোকসান কি ? সে আঙুরী রসে পরান ত তোমার ছিল "অরুণ-বরণী"। পানই যে করতে হবে তার কি কোন মানে আছে ?

ব্রু। নেই ! তুমি বলছ, নেই ? তোমার বয়স কত ?

আমি তার কনুইয়ে হালকা একটা টোকা দিয়ে হেসে বললাম, 'সে কথা থাক। তার পর বলো।'

ব্রু। তার পর ? আমি ক্লারেট্টাকে নাম দিয়েছিলাম 'তাজ'। তোমাদের দেশে যে শ্বেতপাথরের তাজমহল আছে তার মত শুভ্র সুন্দর ছিল সে।

আ। আমার ত মনে হয় যে, জীবন্ত তাজ পাথরের তাজের চেয়ে বেশীই সুন্দর ছিল তোমার কাছে।

ব্রু। ঠিক বলেছ। এই দেখ না, ক্লারেট্টার সেই সাদা রঙ আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। আজ সে পাথর মেরে গেছে। হায়, প্রাণ পেলাম না তাতে।

আ। কেন? সে কি তোমায় আর ভালবাসে না?

ব্রু। সে কথার আজ কোন মানে নেই। যদি সে আজো ভালবাসতে চায় তাতেই বা কি হবে?

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 'জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার' অক্ষয় প্রেমের কথা শুনে এসেছি কাব্যে। অনন্ত অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা লেখে উপন্যাসে। আর বাস্তব জীবনে যে লোকটি চাঁপার কলির মত আঙুরের ধাক্কা খেয়ে যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রবাসী থেকে ফিরে এল, সে এ কি কথা বলছে? ভাল করে তার দিকে তাকালাম।

ব্রু। জান, আমার যখন তোমার মত বয়স ছিল তখন তাজের জন্য কি কাজই না করতে পারতাম? আমার অর্থের অভাবকে পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি অর্থহীন প্রেমের গুনগুনানি দিয়ে। উপহারের অভাবকে মুছে দিতে চেষ্টা করেছি ফুলে ফুলে সাজিয়ে। গণ্ডোলায় চড়িয়ে তাকে নৌকা-বিহারে নিয়ে গিয়েছি। সে আমার হতে রাজী ছিল, কিন্তু তাকে আমি পাইনি।

আ। কিন্তু কার দোষে এমন হল?

ব্রু। দোষ কারো ছিল না। দোষ যদি কারো থাকে তবে আমাদের দেশের নীল আকাশের—যার ওই রকম সুন্দর রঙ হয়েছে আমাদের তরুণীদের চোখের রঙের ছোঁয়া পেয়ে। দোষ এই ভেনিসের জলরাশির, যারা আঁকা-বাঁকা খালগুলির মধ্যে সারা দিন সারা রাত্রি প্রত্যেক রূপসীর জানালার নীচে গান করে করে খেলে বেড়ায়। জান, ভেনিসের জলের এই লীলা-চঞ্চলতা হচ্ছে ইটালিয়ান মেয়েদের হৃদয়-মাধুরীর সজল সংস্করণ।

ব্রুনোর ভাষার কেরামতি আমায় প্রায় দিশেহারা করে ফেলছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, প্রেমে পড়লে মানুষ এমনভাবেই আবোল

তাবোল বকে যায়। আর, পৃথিবীর সব ভাল প্রেমের কবিতাই ত প্রলাপ ও বিলাপের ব্যাপার। অবশ্য ব্রুনোর অনেক কথা ও অনেক উপমা পণ্ডিত বা পাণ্ডাদের কাছে পছন্দের হবে না। সে কিন্তু এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলে উঠবে যে, তার জন্য দোষ দাও—আমাকে নয়, ওই ভেনিসের জলে ভেসে বেড়ান বসন্তের মাতলামিকে।

আ। তার পর?

ব্রু। তার পরের ইতিহাস খুব ছোট্ট—যদিও দীর্ঘজীবন যে কি ভাবেই কাটিয়েছি! ক্লারেট্টার বাবা একদিন এইখানে এইরকম চাঁদের আলোর মধ্যে আমাদের আবিষ্কার করলেন। আমি তখন দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দের সঙ্গে তাল রেখে গাইতে গাইতে ওকে নিয়ে গণ্ডোলায় চলেছি। ওর বাবা ফিরছিলেন আর একটা গণ্ডোলায়। আমার দাঁড়ের ধাক্কায় তাঁর নৌকা ওল্টাবার যোগাড় হয়ে গিয়েছিল। সামলিয়ে নিয়ে তিনি দেখতে পেলেন আমাদের দুজনকে। তার পরের কথা বুঝে নিতে তোমার কষ্ট হবে না।

আ। তুমি কেন তাঁর মেয়েকে চেয়ে বসলে না যৌবনের দাবিতে প্রেমের দাবিতে?

ব্রু। তার কি পথ ছিল, বন্ধু? তার সামনেই ত তার বড়লোক বাবা আমার অক্ষমতাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'আগে সোনার খনি আবিষ্কার করে এস, তারপর আমার সোনামণির কথা ভেবো।' আমিও সেই প্রতিজ্ঞা করে হাতের দাঁড় জলে ভাসিয়ে দিয়ে, ভাসানো পানসিতেই ক্লারেট্টাকে রেখে সাঁতরিয়ে ক্যানাল পার হয়ে প্রবাসী হয়ে গেলাম।

তার পরের কাহিনী ব্রুনো নিজে থেকেই বলে যেতে লাগল। কত দেশে সে ভাগ্য খুঁজে বেড়িয়েছে তার হিসাব নেই। ভারতবর্ষেও সে

এসেছিল তাজ দেখবার জন্য। তাজের সমাধির পাশে চোখের জলে ভেজা যে ইয়োরোপীয়কে আগে রোজ দেখা যেত বলে গাইডরা বলে —সে হচ্ছে ব্রুনো। তারপর মালয়ের জঙ্গলে রবারের ব্যবসার ফটকায় বড়লোক হয়ে সে মাত্র দেশে ফিরে এসেছে। আজ সকালেই সে তার তাজকে খুঁজে বের করেছে এই সামান্য 'রিস্তোরান্তির' মালিকের মধ্যে। ক্লারেট্টার বাবা মারা যাবার পর দেখা গেল যে, টাকাকড়ি কিছুই বিশেষ রেখে যাননি। তার ধনী প্রেমিকের দল সরে গেল ভাঁড়ার খালি দেখে। অভিমানে সে নিজে উপায়ের চেষ্টায় লেগে গেল। বিয়ে করা তার আর হল না।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলে ফেললাম, 'বেশ ত, এখন ত তুমি তোমার তাজ দখল করতে পার।'

মলিন একটু হাসি হেসে সে বলল, 'সেইখানেই ত হল আমার হার।'

বুঝতে পারলাম না। দূরে গণ্ডোলার মাঝিটা ছোট্ট তরীটির উপর ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রুনোর কাহিনী সন্ধ্যাতারার মত আমার মনের আকাশে জ্বলজ্বল করছে। কি যে তার শেষ বক্তব্য তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

আ। সে যখন বিয়ে করেনি, বাপও যখন নেই বাধা দিতে, তুমি বড়লোক হয়ে ফিরে এসেছ—তখন তুমি চাইলেই ত জিতে যেতে পার। এখনি যাও এগিয়ে।

ব্রু। তুমি বুঝবে না, বন্ধু। তোমার বয়স অল্প। তুমি এখনো রচনা করতে পার। আমি আর পারি না।

আ। অর্থাৎ?

ব্রু। অর্থাৎ আমি সেই 'আমি'ই আছি। সেই মন, সেই চাওয়া, সেই আশা, আকাঙ্ক্ষা। এই পঁচিশ বছর আমি যাকে মনে

মনে বসন্তের ফুলে সাজানো তরুণীর রূপেই শুধু কল্পনা করে এসেছি—সে যে আমার মনের সীমা ছাড়িয়ে কৈশোর ও যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়া হয়ে গেছে তা আমি কখনো ভাবিনি। আজ সকালে যে প্রতিমা দেখব বলে ছুটে এসেছিলাম, শুধু তার প্রেতাত্মাকে পেলাম। হায়! এর জন্য ত আমি সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াইনি।

আ। কিন্তু তুমি নিজেও ত আর বিশের কোঠায় নেই। তুমি আর ক্লারেট্টা দু'জনেই কবে যৌবন পার হয়ে এসেছ। তা ছাড়া সেও ত ভাবতে পারে যে, ব্রুনোও ত আর তরুণ নেই।

ব্রু। সে ঠিক তা ভাববে না। সে ত আমার জন্য সব কিছু ছেড়ে মনের দরজা বন্ধ করে পরিবর্তনের গতি আটকিয়ে বসেছিল না। তার চারদিকের অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে সে গড়ে উঠেছে। আমার ত সে অবস্থা ছিল না।

আ। তুমি কি আয়নাতেও কখনো নিজের বয়স বেড়ে যাওয়া লক্ষ্য করনি? অনুভব করনি যে, তুমি আপনা থেকেই বদলিয়ে যাচ্ছ ক্রমে ক্রমে?

ব্রু। তা কখনো করিনি। যদি করতাম, তাহলে হয়ত এমন করে ছুটে আসতাম না। যদি বা আসতাম, নির্বিচারে যাকে পাচ্ছি তাকেই গ্রহণ করতে চাইতাম।

আ। আশ্চর্য! তুমি কি সত্যিই তাকে ভালবাসতে?

ব্রু। ভাল—বাসতাম না? ভালবাসতাম না? তাহলে এতদিন কার কথা ভেবে দিন কাটিয়েছি? এই হতচ্ছাড়া জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি? কার স্বপ্ন মনে আলো জ্বেলে ছিল তাহলে? কার মূর্তি চোখের মণিতে আসন নিয়েছিল?

আ। ঠিক সে-ই ত আছে। তুমি আর সে দু'জনেই যেটুকু

বদলিয়েছ তা শুধু স্বাভাবিক জৈব পরিবর্তন। তাকে তুমি সহজভাবে নিতে পারছ না কেন?

ক্রু। যে জিনিস তর্কের বাইরে তাকে তর্ক দিয়ে হারাতে পার, কিন্তু গড়তে পার না। সেদিন যে আঙুরের গোছা আমার রসনা রসাল করে তুলত, সেই গোছা এতদিন পরে শুধু সেই গোছা বলেই কি মিষ্টি থাকতে পারবে? কোথায় তার সেই রস? তুমি বই-পড়া বালক, তাই বুঝছ না যে আমি পঁচিশ বছর বয়সে এসে ঠেকে রয়েছি এবং সেজন্যই আজ ঠকে গিয়েছি। যতদিন বিদেশে ছিলাম ঠিক ছিলাম। দেশে এসে বেঠিক বেহিসাবী কাজ করে ফেলেছি।

এর পর আর কথা চলে না। চুপ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ তার হিসেব নেই। শুধু চাঁদ মাথার উপর দিয়ে উঠে অন্যদিকে হেলে যেতে লাগল। জ্যোৎস্নার বান আশেপাশে জলরাশিতে নতুন নতুন আলপনা কাটতে লাগল। এই চত্বরে বসে এক সময় বিখ্যাত প্রেমিক ক্যাসানোভা তার অসংখ্য প্রণয়িনীদের প্রেমপত্র লিখত, আর তার চারদিকে ধানের লোভে পায়রার দল বকম বকম করে অলস দুপুরগুলিকে ভরে তুলত। সেই চত্বরের একপাশে জলের ধারে আমি বেদনায় বিবশ হয়ে বসে রইলাম।

ধীরে ধীরে ক্রুনোর মতটার জন্য একটা করুণতা অনুভব করতে লাগলাম। সত্যিই ত। জীবনের উষায় যে ঠোঁট দুটি রক্তগোলাপের পাপড়ির মত সরস ছিল, সারা দুপুরের গরমের পরও সে ঠোঁটদুটিতে যে উষারই স্বপ্ন দেখে চলেছে, সে ঠকে যাবে না তো কি হবে? হায়! প্রেমিক-প্রেমিকারা সময়ের সাগরতীরে বসে বালির কেল্লা গড়তে ভালবাসে। কিন্তু সে সাগর ত সেদিনের জলরাশিকে সেখানেই রেখে যায় না। ইহলোকে কারো প্রেমের জন্য থাকবার অবসর নেই।

'আজ' হচ্ছে সত্য, একমাত্র সত্য। আগামী কালই সে হয়ে যাবে অতীত ও মিথ্যা। কবি গেয়ে গেছেন অনন্ত প্রেমের মহিমা, কিন্তু মানুষ চেয়ে যায় আজকের ছোট্ট প্রেমের মাধুরী। বর্তমানও অনন্তের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম সত্য নয়।

হঠাৎ পাশে তাকিয়ে দেখি ব্রুনো নেই। নিজের মনের ভার হালকা করে কখন বোধ হয় সে চুপিচুপি উঠে গেছে। অন্তরকে খুলে দেখানর লজ্জায় সে বোধ হয় আর আমার চিন্তাকে বাধা দিতে চায়নি। এ কথা ভেবে একটু সান্ত্বনা পেলাম যে, সহানুভূতির মায়াকাঠিতে একজনের মনের দুয়ার খুলতে পেরেছিলাম। এই প্রৌঢ়েরই মত কত জন নীড় বাঁধবার সাধ শেষ করে দিয়ে প্রিয় গৃহ ও প্রিয়াকে ছেড়ে চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তরে বা আফ্রিকার পোড়া জঙ্গলের মধ্যে। তারপর কতজনেরই যৌবন-স্বপ্ন হয়ত এরই মত করুণভাবে শেষ হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস আপনার অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এল। ভেনিসের জলরাশি সে নিঃশ্বাসে দুলে উঠল। সমস্তটা মধু রজনী সে দীর্ঘশ্বাসে সাড়া দেবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পরদিন সকালে উঠেই সেই কথাগুলি আবার মনকে অস্থির করে তুলতে লাগল। ব্রুনোর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। এ ভুলের জন্য তার বাকী জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। ক্লারেট্রাও কম কষ্ট পাবে না। বৃথাই আমি শেলী রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, যদি তার এই ভুলটা তাকে না বুঝিয়ে দিতে পারি। তাকে এখনই খুঁজে বের করতে হবে। জ্যোৎস্নার আলোতে লোকে একটু বেশী করেই অবাস্তব ও সেন্টিমেণ্টাল হয়ে ওঠে। কিন্তু দিনের আলো বাস্তব দৃষ্টিপথ বের করে দিতে পারে। তাই তাকে আজ সকলেরই বোঝাতে হবে তার ভুলের কথা।

ভুল, নিশ্চয়ই ভুল। আমায় সে বাইশ বছরের বই-পড়া বালক বলে মনে করে। কিন্তু সে জানে না বইয়ে কত সময় সত্যের আলো দেখতে পাওয়া যায়। কোনরকমে ব্রেকফাস্ট শেষ করে ছুটলাম খালের পারে। এবারে আর সোনার পাথরবাটি অর্থাৎ ইঞ্জিনে চালানো নৌকোয় কোন আপত্তি বোধ করলাম না। রিয়াল্‌টো সেতুর পাশে সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে ব্রুনোর ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি বের করতে হবে। কি জানি যদি সে এতক্ষণে আবার দূরদেশে পাড়ি দিয়ে থাকে। বলা যায় না।

রিয়াল্‌টোর ঘাটে নেমে ক্লারেট্টার রেস্তোরাঁয় যেতে একটু ইতস্ততঃ করলাম। ওকে কি করে জিজ্ঞেস করব ব্রুনোর কথা? কি না জানি ভাববে। অথবা হয়ত লজ্জা পাবে। বুঝতে কি আর পারবে না যে, একটা মোহিনী রাতের মায়ার সুযোগ নিয়ে আমিও তাদের কাহিনী জেনে ফেলেছি?

গা ঢাকা দিয়ে ঘাটের পাশে একটা ছোট কেক বিস্কুটের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, 'জান কি ওই রেস্তোরাঁয় যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্রুনো কাল এসেছিল, সে কোথায় থাকে? যে ব্রুনো মাত্র কাল বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে এখানে,—সেই ব্রুনো?

দোকানী অবাক্ হয়ে গেল। বলল, 'ব্রুনো ত মশায়, এখানে একজনই আসে। ওই রেস্তোরাঁর বুড়ীর সঙ্গে খুব ভাব। রোজই আসে। আর যা জুয়ো খেলতে পারে, মশায়! যেমন জুয়ো খেলে, তেমনই 'কিয়াস্তি' খায়। ওস্তাদ, পাঁড় ওস্তাদ।'

এ কথা বলেই খাস ইটালীয় নটবর ভঙ্গিতে দুই ঠোঁটের মাঝখানে জিভ রেখে রসিকতা করে একটা শব্দ করল।

আমি একটু অধীর হয়ে বললাম, 'না না, সে নয়। যে কালই মাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছে তার কথা বলছি।'

দোকানী বলল, 'ও তো একই লোক, সিনর। যদিও পড়ুয়া লোক, পেটে ভালভাবে 'কিয়াস্তি' পড়লে সে অনেক দেশই ঘুরে আসে। কাল বুঝি সে আপনার খরচায় খেয়েছিল ?'

সত্যিই ত। কাল তার কাহিনী শুনবার লোভে তাড়াতাড়িতে তার বিল্‌টা আমিই মিটিয়ে দিয়েছিলাম! আর কিছু শুনতে ভাল লাগল না। ধীরে ধীরে সরে গেলাম।

আস্তে আস্তে সূর্যের তাপ চড়ে উঠতে লাগল। কিছুই ভাল লাগছে না। এলোমেলো মন নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শেষে হয়রাণ হয়ে লিডোর সমুদ্রস্নানের তীর ছাড়িয়ে একটা বাগানে ঝাউ গাছের ছায়ায় বসলাম। নীল আকাশ, নীল জল, মনে বেদনার নীল আভাস। জলো হাওয়া ধীরে ধীরে আমার মানসিক ও দৈহিক অবসাদ মুছে দিতে লাগল। ক্রমে নিজেকে আবার গড়ে নিলাম।

সেই গড়ে নেবার ক্ষমতাটাই সত্য বলে মনে হল। ব্রুনো আমায় ঠকিয়েছে। ভেনিসের পূর্ণিমা রজনীর বিহ্বলতা আমায় ঠকিয়েছে। কিন্তু, কিন্তু হোক্ সে প্রবঞ্চনা—না-হয় লোকে মনে করুক যে দু এক গ্লাশের ফলেই এমন একটা বোকামি আমি করেছিলাম। বিজ্ঞ ও কাজের লোকরা অনুকম্পা করে আমার কালকের রাত্রিটিকে একটু মুচকি হেসে সম্মান দেবেন। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যে ব্যিডেকারের গাইড বুকে লেখা 'প্রাসাদের রাজপুত্রী' বা 'দুর্গম দুর্গের অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ' প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন কাহিনী বিশ্বাস করে, লোকে তাকে বোকা-ই বলবে। ও-সব কাজ ভদ্রোচিত অর্থাৎ 'রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল' নয়।

না হোক্। তবু আমি সেই গল্পে এখনো বিশ্বাস করি। না করে উপায় কি ? ব্রুনো আর তার তাজের প্রেমকাহিনী শুনে রাতে আমার

ঘুম আসছিল না মোটেই। চঞ্চল হয়ে পাইচারি করতে করতে একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলাম ব্রুনোর তাজকে উপহার দেব বলে ঃ

ধরণীর ধূলি প্রেম
মরণেরে দিল অমরতা—
নিরুপায় নিরজনে
রাখি গেল তোমার বারতা ;
মর্মরের মর্মমাঝে
দিয়ে গেনু জোছনা আখরে
অনন্ত কালের পাতে
সান্ত মোর জীবন স্বাক্ষরে।

সে কবিতার পিছনে যে অনুভব ছিল, তা ত মিথ্যা নয়।

সে গল্পে বিশ্বাস না করে উপায় কি ? ভেনিসে যে মদির চাঁদিনী রাতে নীল সমুদ্রের জল এখনো গণ্ডোলার আশে পাশে মায়াজাল বুনে বুনে যায়। সে সব স্মৃতি সব সময় মনে আসবে না। যদি বা আসে, দিবাস্বপ্নের মত বাজে বলে মনে হবে। প্রেমকে যে সব রকমে এড়িয়ে চলা উচিত সে কথা বহুবার নিজেকে বুঝিয়ে দিয়েছি। হয়ত আর কখনো কোন মুগ্ধ নিশীথে চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া আর মনে দরদভরা মায়া নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসব না। কাজের ভিড় ঠেলে কোন প্রেমকাহিনীর অস্ফুট আবেদন মনের গহন ভরে উঠবে না। সম্ভবত ভেনিসের রাত্রিগুলি শুধু স্বপ্নই।

কিন্তু সে রাত্রিটি ত স্বপ্ন নয়।

ফ্রাঙ্কোর নীল কোর্তা পরা ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল চারদিক প্রায় ঘিরে ফেলেছে। আমার পলায়নের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে এল অথচ আর কিছু দূর লুকিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই হয়ত ফরাসী সীমান্তে পৌঁছে যেতে পারব।

কিন্তু পারব কিনা জানি না। যে কোন সময়ে এই পাহাড়ী অঞ্চলের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে মূর্তিমান যমের মত কাফ্রি সৈন্য। ছুটে আসবে ওদের বন্দুকের গুলী। ভয়ে ভয়ে পাহাড়ের তলায় তলায়, গাছের পর গাছের আড়াল দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমি, বাঙালী মেয়ে অনিতা আর নন্দ অর্থাৎ ফার্নান্দো।

বিপদ বড় ঘনিয়ে এসেছে। তাই এই অতীতের একটা মাসের দিকে পেছন ফিরে তাকাতে সময় পাচ্ছি না। অথচ বুঝতে পারছি যে জীবনের সব চেয়ে বড় লাভ পেছনে ফেলে চলে আসছি—প্রাণে বাঁচবার চেষ্টায়। নিরাপদ হয়ত হতে পারব, কিন্তু নিঃসম্পদ হয়ে। স্বাধীনতা হয়ত বজায় থাকবে, কিন্তু শত স্মৃতি সে স্বাধীনতাকে বেঁধে রাখবে।

আমি বাঙালীর মেয়ে অনিতা পাল বিলেতে বাপ-মায়ের পয়সায় পড়তে এসেছিলাম। বেশ ত, পড়াশুনা শেষ করে এডুকেশন ডিপ্লোমা নিয়ে ঘরের মেয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে ঘরে ফিরে গেলেই পারতাম। আর বাবা মা ত তাই চেয়েছিলেন। বিলেতের খোলা নীলাকাশে বাঁধনছেঁড়া পাখীর মত খেয়াল খুশীতে চরে বেড়িয়েছি। কিন্তু তার পেছনে ছিল খড়-কুটার ব্যবস্থার কথা। পেটের জন্য ত নিশ্চয়ই। চাই কি, নীড় বাঁধবার সঙ্গী জুটে গেলেও কেহ অসুখী হত না, যদি দেশ

ও সমাজ বাঁচিয়ে সেটা সম্ভব হত। তা ত হলই না—উল্টে কি যে হতে যাচ্ছে তা নিজেই বুঝতে পারছি না। তার সময়ও নেই।

ঘরের মেয়ে ঘরেই ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ জিব্রাল্টার পর্যন্ত পৌঁছে স্পেনের সন্ধানে নেমে পড়বার শখ হল। অদৃষ্ট, অজানা অদৃষ্ট। জিব্রাল্টারের পাহাড়ের তলায় স্পেনকে বড় সুন্দর লাগল। লোভ হল, পশ্চিমের মধ্যে পূব দেশ, ইউরোপের ভারতবর্ষ স্পেনকে একবার দেখে যাব। বাবাকে টেলিগ্রাম করে দিলাম বোর্দোতে টাকা পাঠাতে। সালামাঙ্কার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দেখে, সান সিবাস্টি-য়ানের পাহাড়ে ঘেরা নীল সমুদ্রে স্নান করে, ইরুন পাসের ভেতর দিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে আবার জাহাজ ধরব। টমাস কুককে বলে দিলাম, মার্সেলসে পরে যে জাহাজে যাব, তার জন্য মালপত্র জমা করে রাখতে।

টেলিগ্রাম পেয়ে অধীর হৃদয়ে অপেক্ষা করতে করতে মা নিশ্চয়ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। সে কথা এখন 'সোমোসিয়েরা' পাসের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে চলতে চলতে প্রায়ই মনে হচ্ছে। এ পথ দিয়ে সওয়া শ বছর আগে নেপোলিয়নের পোলিশ সৈন্যরা স্পেন অধিকার করতে চলেছিল। বাঙালিনী, প্রায় একাকিনী, অনিতার পলায়নের জন্য এ পথ তৈরী হয়নি।

ভুল, ভুল করেছি। এই বাইশ তেইশ বছর বয়সটাই ভুল করবার বয়স। না হলে কাগজ পড়ে এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে, স্পেনে এ সময় না আসাই ভাল। কিন্তু আমি বিদেশিনী। যদি বা এক আধটা দাঙ্গা হয় আমার দেশ ও পরনের শাড়ীই আমার পাসপোর্ট। তা ছাড়া জীবনে ত আর এ সুযোগ পাব না। এ সব ভেবেই নেমে পড়েছিলাম জাহাজ থেকে। কিন্তু এ ভুল আমায় এক হাতে দিল ভয় ও বিপদ, অন্য হাতে দিল আনন্দ আর পরম লাভ। এ ভুল আমার মাথার মণি হয়ে থাকুক।

মাদ্রিদে একটা সুন্দর কিন্তু ছোট্ট হোটেলে উঠেছি। আমার ঘরের ঝুল-বারান্দা থেকে 'কালিয়ে আলকাল্লা' রাস্তায় হল্লা আর হুল্লোড় দেখতে বেশ ভাল লাগে। মনে হয়, প্রায় দেশে এসে পড়েছি। অথচ বিদেশের বাধাহীনতা ও স্বাধীনতার মধ্যেই আছি। পথে পথে বার্লিনের সুকঠিন নিয়মকানুন বা লণ্ডনের গতির স্রোতে ভেসে যাওয়া নেই। হিস্পানীর দল পথের মধ্যে 'কাফে'র সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের খাসদখল প্রমাণ করে গল্প করছে। বিদেশিনী আমি বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করলাম। যাব কি নীচে রাস্তায় নেমে? ওরা যেমন দিলদরিয়া লোক, নিশ্চয়ই আমায় সঙ্গ দেবে, দেখবার জায়গাগুলি দেখিয়ে দেবে। তাহলে এই মামুলী বাঁধি গৎ আওড়ান গাইডগুলির হাত থেকেও বাঁচা যাবে।

কিন্তু বেশী ভাবতে হল না। আমার দরজায় মৃদু টোকা পড়ল ও প্রশ্ন হল, 'সিনরিটা, আসতে পারি কি?'

আমার মৃদু সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আবার নাড়া পড়ল। ঘরে ঢুকে পড়ল স্পেনের স্বচ্ছ উজ্জ্বল আলোর একটি ঝলক—নাম তার ফার্নান্দো। আমারি পাশের ঘরের বাসিন্দা। তার সঙ্গে আলাপের জন্য উঠে এলাম হোটেলে মূরীয় কারুকার্য করা বৈঠকখানায়। আমাদের সামনের টিপয়ের ঢাকনাটি ছিল নীল রঙের। বিকেলের উজ্জ্বল আলো ফার্নান্দোর হাসিখুশী মুখে খেলা করছিল। কিন্তু প্লেন গাছের ছায়াঢাকা 'রাম্‌ব্লা' অর্থাৎ সন্ধ্যায় বেড়াবার রাস্তার স্নিগ্ধ শান্তি ছিল তার চোখে। আর বৈঠকখানার পাশের ঘরের বাসিন্দা পেরু দেশের মেয়েটি তখন সবে গীটারে এক আধটা মধুর গুঞ্জন তুলতে আরম্ভ করেছে।

আলাপ পরিচয়ের পর ফার্নান্দো বলল যে, আমি নিশ্চয়ই অচেনা জায়গায় অসুবিধায় পড়েছি। কাল থেকে—যদি সিনরিটা কোন

আপত্তি বা অসুবিধা বোধ না করেন—সে আমায় শহর দেখিয়ে বেড়াবে। আজ সন্ধ্যায় তার সময় নেই, তবে সে আমায় এমন একটা নাচঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতে পারে যেখানে আমি খাঁটি হিস্পানী হরেক নাচ দেখে আসতে পারব। তারপর আমি নিশ্চয়ই ফেরবার পথে ট্রামের নম্বর দেখে বা ট্যাক্সিতে ঠিক মতই চলে আসতে পারব।

আমি ত হাতে স্বর্গ পেলাম। আহা, সিনর ফার্নান্দো চিরানন্দে যেন থাকেন সেই শুভ কামনা করলাম। সে চেয়ার থেকে উঠে প্রায় হাঁটু গেড়ে সামনে ডান হাত আধখানা চাঁদের মত ছড়িয়ে দিয়ে সম্মান দেখাল। বলল, সিনরিটা য়্যানিটা পোলা তাকে যে সম্মান দেখালেন, তার বিনিময়ে সে স্পেনের শ্রেষ্ঠ মাতাদোর (বুল্-ফাইটের অর্থাৎ ষাঁড়ের লড়াইয়ের সর্দার) হতেও চায় না। যাক্, ষাঁড়ের লড়াইয়ের প্রতি যে তার ভক্তি থাকলেও আসক্তি নেই, এ শুনে নিশ্চিন্ত হলাম মনে মনে।

সে সন্ধ্যাটার কথা ভুলব না। হিস্পানী ট্যাঙ্গো নাচের তুলনা নেই পৃথিবীতে। যে নাচে এবং যার সঙ্গে নাচে দু'জনেই অর্কেস্ট্রার মাতাল-করা মূর্ছনার তালে তালে আনন্দ-দোলায় ভাসতে থাকে। আমার বহু পূর্বপুরুষ ধরে রক্ষণশীল শিরা-উপশিরায় রক্ত জোরে ছুটতে লাগল। এত মাদকতা, এত বসন্ত-পূর্ণিমার আবেশ যদি আসে একজনের বাহু জড়িয়ে নাচলে, তাহলে লাভ কি ওই শত শতাব্দীর পুরোনো মরচে-পড়া সামাজিক সংস্কার আঁকড়িয়ে থেকে? হায়! এই দু'টো বছরেও বিলেতে নাচ শিখতে কোন দিন ইচ্ছা পর্যন্ত হয়নি। আজ নিজেকে বড় একা মনে হতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ অর্কেস্ট্রার বাজনা থেমে গেল। প্রায় নিবু-নিবু নীল বাতি পুরোপুরি জ্বলে উঠল। চারদিক তখনো নাচ আর বাজনার

রেশে গমগম করছে। এমন সময় স্টেজের উপর থেকে নাচঘরের কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল যে ফ্রাঙ্কোর বাহিনী আজ বিদ্রোহ করেছে। হিস্পানী সরকার ঘোষণা করেছেন যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে লড়াই করে একেবারে নির্মূল করতে হবে। অতএব স্পেনবাসী সবাই লড়াইয়ের জন্য চটপট তৈরী হও।

ভয়ের চোটে সবারই নাচ খতম। সবাই নাচঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমিও বের হলাম অসহায়ের মত। পথে ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে আর সব ট্যাক্সি চলে গেছে দেখে আরো বেশী অসহায় বোধ করলাম। কি করব ভাবছি। চারদিকে সবাই পালাচ্ছে দেখে আরো ভয় লাগছে—এমন সময় দেখলাম, সামনে দৌড়তে দৌড়তে আসছে ফার্নান্দো।

বিদ্রোহ ঘোষণার খবর পেয়েই সে বুঝতে পেরেছিল যে আমার ফিরতে মুশকিল হবে। তাই সে অন্য কাজ ফেলে ছুটে এসেছে এখানে। যদি আমার কোন অসুবিধা হয় তাহলে হোটেলে পৌঁছে দেবে। তাকে পেয়ে আমি অকূলে কূল পেলাম। দেখলাম যে, আমার যখন দরকার তখনি এসে পৌঁছতে পেরেছে বলে তারও মুখে একটা আনন্দ ফুটে উঠেছে। আরো অনুভব করলাম যে, তার কাজল-কালো আঁখিতে আপদের মধ্যে—আঁধারের মধ্যেই একটু আনন্দ করে নেবার জন্য, একসঙ্গে একটু য়্যাডভেঞ্চার করবার জন্য একটা আমন্ত্রণ ফুটে উঠেছে। সে আঁখির আমন্ত্রণকে 'না' বলা যায় না। আমিই বললাম, 'আজ রাত্রে চলুন কোন রেস্তোরাঁয়, যেখানে 'সাপার' পাওয়া যায়। এখনি হোটেলে নাই ফিরলাম?'

মহা খুশী হয়ে সে বলল, 'কোন বড় জায়গা নিশ্চয়ই এই অবস্থায় খোলা থাকবে না, কিন্তু আমার মত ডানপিটে লোকদের জন্য সর্বদাই সরাইখানা খোলা থাকে। সেখানে যা খেতে পাওয়া যায় তাতে

আপনি বোধ হয় শক্‌ড্‌ হবেন, কিন্তু সেখানে সব কিছুই খুব রোম্যান্টিক।'

তখনো ট্যাঙ্গোর রেশ মনকে হরিণীর মত দিশেহারা করে রেখেছে। উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, 'চলুন, সেখানেই যাওয়া যাক্‌। সেখানেই পাব প্রকৃত স্পেনের পরিচয়। আপনি হবেন আমার গাইড।'

রাতের আঁধারে হাঁটতে হাঁটতে একটা সরাইখানায় গেলাম। সেখানে সোনালী রঙের 'ম্যানজানিলা' পরিবেশন করল প্রথমেই। তার বদলে আমি নিলাম নারাঙ্গি। কিন্তু মন-কুরঙ্গী তখন—আজ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে লুকাব কেন? ম্যানজানিলার দিকেই ঝুঁকেছে। যে রঙ মনে অনুভব করছি তা ওই সোনালী মদেরই রঙ, নারাঙ্গির নয়। খুপরির মত একটা কাঠের কুঠরীতে বসলাম দুজনে। আধখানা ঝলসানো হ্যাম এনে দিল আর কালো সরস জলপাই এক প্লেট। বেতের সুন্দর কাজ-করা চুপড়িতে ভরা আঙুর আর কমলা। আরো কিছু খাবার আনতে বলাতে একটা ছোকরা ঘরের দরজা খুলে চিক্‌ তুলে সামনের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। কি? না, রাস্তার ওপারের দোকান থেকে মাছ ভাজা আর আলু ভাজা নিয়ে আসবে।

লণ্ডনের সাজানো গোছানো হোটেলে খাওয়া আর আজকের রাতের নাচঘরের বিলাস তখন বাইরের অন্ধকারে মুছে গেছে। আমি সাহসিনী বাঙালিনী অনিতা পাল 'য়্যানিটা পোলা' হয়ে চুপিচুপি ফার্নান্দোকে ডাকলাম, 'নন্দ, আপনি 'ফানি' নন্দ।'

হেসে অথচ রাগের ভান করে সে বলল, 'কি? আজ আমাদের দেশে বিদ্রোহ হয়েছে বলে কি আপনি ঠাট্টা করতে শুরু করলেন? আমি 'ফানি' নই, আপনাকে একটু 'ফান' দেব বলেই এখানে এসেছি। জানেন, এই সরাইখানার ছোকরারা ছোরা ছুঁড়তে পারে বন্দুকের গুলীর মতই টিপ করে?'

ঘাবড়িয়ে গেলাম খুব। এটা কি তবে মাদ্রিদের মেছোবাজার নাকি? কিন্তু সে হেসে বলল, 'সিনরিটা পোলা, ভয় পাবেন না। আমরা অতিথিপরায়ণ। আমরা যেমন ফাঁসাতে জানি, তেমন ভালবাসতেও জানি।'

ট্যাঙ্গোর রেশে তখনো আমার রক্তধারা চঞ্চল হয়ে আছে। বললাম, 'তাহলে ত নিজেরাই ফেঁসে যাবেন।'

এই প্রথম তার সুন্দর আঙুলগুলি লক্ষ্য করলাম। তার হাত দুটি যেন ছবি আঁকবার জন্য, পিয়ানো বা গীটার বাজানর জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেছিলেন। হাতের আঙুল মট্কাতে মট্কাতে সে বলল, 'তা ঠিকই, সিনরিটা পোলা। আমরা শুধু ভালবাসি না, ভালবাসাতেও জানি। আমাদের দেশে প্রেম হয় প্রথম দর্শনেই। বর্তমান সঙ্গকে বাদ দিয়েই অবশ্য আমি বলছি। আর প্রেম হয় ভোর থেকেই। ইংলাটেরাতে (ইংলণ্ডে) প্রেম জমাট বাঁধতে চায় না, যতক্ষণ না সন্ধ্যার কক্টেল তাকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু আমাদের শিরাতে যা বয় তা লাল রক্ত নয়, লাল মদ।'

এ কথা বলে সে এমনভাবে কাজল কালো দুটি চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল যে মনে হতে লাগল, তার চোখের চাউনির মধ্যেও বুঝি মদ বইছে। তার নেশা এমন সংক্রামক যে—আমি, রক্ষণশীল দেশের পুরোনোপন্থী পরিবারের বাঙালী মেয়ে, আমিও তার কথার তোড়কে বাড়াবাড়ি বলে মনে করতে পারলাম না। বরং মনে হল, তার চটকদার কথাগুলির উচিত মত জবাব না দিতে পারলে সমস্ত নারী জাতির প্রতিনিধিত্বের যে দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে তা সামলান যাবে না। শুনেছিলাম, এ দেশে যে মেয়ে রসাল রসিকতায় কটাশ কটাশ জবাব দিতে পারে, সমাজে তাকে তারিফ করে।

মৃদু হেসে বললাম, 'সে কথা যে সত্যি তা ত বুঝতেই পারছি। না

হলে মোটে একদিনের আলাপ, এখনি আপনাকে আপনি বলব, না তোমাকে তুমি বলব সে নিয়ে ভাবছি। অবশ্য ফার্নান্দো নামটা 'ইনফারনাল' (নারকীয়) ভাবে লম্বা বলেই 'নন্দ' বলে ডাকছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে, আপনাদের দেশে যদি এত ভাল-বাসার হাওয়া বইছে, আপনাদের জানালাগুলিতে এত গরাদ কেন ?'

'ক্ষতি কি তাতে ?' টানা টানা দুটি চোখও মুখের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে বসল। 'ক্ষতি কি তাতে ? গরাদগুলি লোহার বটে, কিন্তু কেমন কারুকার্য তাতে আছে তা লক্ষ্য করেছেন কি ? আমাদের শিল্পী আর প্রেমিকরা লোহাকেও সোনার মত স্নুন্দর করে তৈরী করেছে।'

তা ঠিক বটে। এক একটা করে সরস মধুর আঙুর মুখে দিতে দিতে ভাবলাম—সত্যিই বটে। না হলে এমন সস্তা সাধারণ একটা সরাইকেও সেরা রেস্তোরাঁ বলে মনে হচ্ছে কেন ?

যে চিন্তার মধ্যে আমার দিনগুলি যেতে লাগল, সেগুলিকে ডিনারের সময় হালকা করে দিত ফার্নান্দো। স্পেনে কোন্‌টা ভাল খাবার তা বিদেশীর কাছে অজানা থেকে যায়। আমার কি ভাল লাগবে তা সে যে কেমন করে বুঝতে পারত তা সে-ই জানে। বিশেষ করে আমার জন্যই সে বিকেলে পার্কে বেড়াতে যাবার সময় আনাত রাইয়ের রুটি। কি তার রঙ আর কি বা গন্ধ। মুচমুচে অংশটা মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। তার সঙ্গে আনত ছাগল-দুধের পনীর আর জলপাই। যেন রাজার হালে নির্ভাবনায় আছি।

রাত্রিতে খাবার আগে প্রথমে আনাত 'ত্রে কোয়ার্তো ডি ওরা' অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে তৈরী করা মাংস, চাল ও সব্‌জির স্নুরুয়া। তার পরেই আনাত 'আরোজ আ লা ভ্যালেন্সিয়ানা'। তাতেও সেই চাল, জাফরান আর লঙ্কা, গল্‌দা চিংড়ীর টুকরো, মুর্গির নরম মাংসের টুকরো, গুগলি—আরো কত কি যে থাকত তার মধ্যে।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কত পুরোনো কালের গল্প, কত কাব্য-কাহিনীর কথা সে বলত। ভুলে যেতাম যে বিদেশে এসে আটকিয়ে গিয়েছি। এক ভাতই বিদেশে ভেতো বাঙালীকে ভুলিয়ে রাখতে পারে, তার উপর তার আনন্দ আর সহানুভূতিতে ভরা সঙ্গ।

এমনি করে দিনের পর দিন 'হোটেল আগিলারে' কেটে যেতে লাগল। সেখানে মূরীয় কারুকার্য-করা বারান্দায় রোজ আলোচনা করতাম কোন্ পথে ফিরে যেতে পারি। যে পথে ফিরবার কথা ছিল, তার কাছে অনেক জায়গা ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা দখল করে যুদ্ধ চালাচ্ছে। দক্ষিণে অনেক জায়গা এখনো খোলা আছে, কিন্তু নিরাপদ নয়। আমার হাতে আর টাকাও নেই। একমাত্র চেনা লোক এই ফার্নান্দো, কিন্তু সে ত শুধু ছাত্র, আর তার সেভিলের বাড়ী ফ্রাঙ্কোর দখলে চলে গেছে। পথ অন্ধকার।

তার সঙ্গে একদিন ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে গেলাম। কোন কর্তা ব্যক্তির দেখা ত পেলামই না, বরং যে সব কলোনিয়াল ইংরেজ ভিড় করেছিল, তাদের কাছে বুঝলাম যে আগে তাদের ব্যবস্থা হলে তবেই আমার মত ফালতু লোকের কথা ভাবা হবে। দু এক দিন হাঁটাহাঁটি করে সে পথ ছেড়ে দিলাম।

একমাত্র আশা ফার্নান্দো। স্পেন থেকে বের হয়ে ফ্রান্সে হাঁটা পথে পৌঁছবার পথ সে জানে। সীমান্ত অঞ্চলে অনেক বিপদে ভরা অজানা পাহাড়ী পথ আছে। সেখান দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু পারব কি আমি কষ্ট করে পাহাড় চড়াই করতে? আধপেটা খেয়ে বিপথে বিপদে এগিয়ে যেতে? যে কোন গুণ্ডা বা বিদ্রোহীর গুলী খাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও? যদি পারি, তাহলে ট্রেনে যত দূর এখনো যাওয়া যায় গিয়ে ফার্নান্দো গুপ্তপথে আমায় ফ্রান্সে পৌঁছিয়ে দিয়ে সৈন্যদলে যোগ দেবে।

অন্য কোন পথ নেই দেখে, সেই অজানা পথের খোঁজেই বেরিয়ে পড়লাম। তার পরের দিনগুলি কোথা দিয়ে যেন চোখের পলকে কেটে গেল।

এই গতকালই কি ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেল!

সীমান্তে প্রায় এসে পড়েছি। ফ্রাঙ্কোর দলের একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে না গেলে উপায় নেই। তার চার পাশে পীরেনিজ পাহাড়ের কয়েকটা উঁচু চূড়া রয়েছে। পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। নন্দ একলা গ্রামের চার পাশে ঘুরে এসে বলল, 'চলো, সব প্ল্যান ঠিক করে এসেছি। কিন্তু দেখো, ভয় পেয়ো না মোটেই।'

আমি তত দিনে ভয় ও কষ্টের জন্য আর গ্রাহ্য করি না।

গ্রামে সরাইখানায় গিয়ে যা আশা করেছিলাম, তা-ই দেখলাম। মাথায় ত্রিভঙ্গ ধাঁচের টুপী-পরা 'কারাবিন্যেরো'র দল রাইফেল ও কফি হাতে বসে আছে। কাউন্টারের ওপাশে দুজন হিস্পানী মেয়ে। অত্যন্ত রকমের হিস্পানী। তাদের কালো চুল আমাদের চুলকে প্রায় হার মানায়, আর আঁখির বিদ্যুৎ ওই রাইফেলের গুলীর চেয়ে বেশী চম্‌কিয়ে তুলবে। তারাই অবশ্য এখন চম্‌কিয়ে উঠল আমায় দেখে।

ফার্নান্দো তাদের বলল যে, আমি ইণ্ডিয়া ইংলেসার মেয়ে হলেও লাল ফৌজের অত্যাচারে স্পেন জর্জরিত হচ্ছে বলে তাদের সহানুভূতি দেখাতে এসেছি এবং স্পেনের মুক্তি এনে দেবার জন্য ফ্রাঙ্কোর জাতীয়-বাহিনী কি রকম যুদ্ধ করছে তার বর্ণনা আমার দেশের কাগজে পাঠাচ্ছি।

এই না বলেই ফার্নান্দো একটা বিশেষ নটবর ভঙ্গিতে মিলিটারী সেলাম করে মেজরকে বলল, 'কিন্তু মেজর, একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে। আমি আর সিনরিটা পোলা একজন লাল-ফৌজের অফিসারকে এই একটু আগে জঙ্গলে ঢুকতে দেখলাম। হয়ত

গুপ্তচরই বা হবে। কি জানি, রাত্রিতে চুপিসারে আলো দেখিয়ে আমাদের এই জাতীয় আস্তানাকে লাল এরোপ্লেনের কাছে যদি ফাঁস করে দেয়?'

'কডিল্লোর জয় হোক্' বলে হেঁকেই সে আবার একটা সামরিক সেলাম ঠুকে দিল।

আমার পেটের ভেতরটা ততক্ষণে ঘুলিয়ে উঠেছে। ভয়ানক ভয় হল যে, ফার্নান্দো হয়ত কোন নির্দোষ লোকের জীবনের বিনিময়ে এই গ্রামের ভিতর দিয়ে পালাবার বন্দোবস্ত করছে। কিন্তু ভাবতেও সময় দিল না সে।

হঠাৎ তার কোমরের 'নাভাজো'টা বিদ্যুতের মত খুলে ধ'রে মাথার উপর ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'এই জিনিসটাই হচ্ছে সেই গুপ্তচরের একমাত্র ওষুধ।'

বলেই সে ছুটল কাছের পাহাড়ী জঙ্গলের দিকে। তার হাতে 'নাভাজো'র বাঁকানো কম-সে-কম তিন ইঞ্চি চওড়া আর আট ইঞ্চি লম্বা ফলা সূর্যের আলোতে যেন নাচতে নাচতে ছুটল। পেছনে পেছনে ছুটল জাতীয় সৈন্যদের দল আর সহজেই তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। হিস্পানী হুল্লোড় কাকে বলে তা আমি দেখেছি। হৈ-হৈ করতে করতে সবাই কাকের পেছনে ছুটল। কানটা কোথায় আছে বা কে কাককে তাড়া করতে বলেছে, তার হিসাব রাখবার জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই। ফার্নান্দো ততক্ষণে তার অভিনয় শেষ করে আমায় সঙ্গে নিয়ে আবার শুরু করল জঙ্গলে জঙ্গলে পালানো।

কিন্তু এমন করে আর যে পারি না। শুনেছি যে, ফ্রাঙ্কোর দলের জেনারেল মোলা তার অক্টোপাস ব্যূহ ক্রমেই এ এলাকাতে ভাল করে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। আর বেশী দিন গেলে আমার বেরিয়ে পড়বার কোন পথই আর বাকী থাকবে না। তা ছাড়া, নন্দর জন্যই

আমার ভয় বেশী। আমি হয়ত কোন বড় অফিসারের সামনে হাজির হয়ে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এ দেশ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়বার একটা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু নন্দ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তার চিহ্ন লাল রুমালটা সে তলপেটের নীচে লুকিয়ে রেখেছে। সে ধরা পড়লে সেটাও ধরা পড়বে। ফল হবে চোখবাঁধা অবস্থায় দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে সারি সারি ভরা বন্দুকের গুলী। উঃ, মা গো। ভাবতেও পারি না।

কড়া রোদ চারদিকে। যদিও একটা বড় পাথরের আড়ালে গাছের তলায় লুকিয়ে আছি, ভাবতে ভাবতেই মাথা ধরে আসছে। কতক্ষণ হল নন্দ গিয়েছে কিছু খাবার ও গুপ্তপথের খোঁজ করতে। কিন্তু এখনো ফিরল না। একটা অজানা বিষাদ, ঠিক ভয় নয়, মনটাতে সন্ধ্যার অন্ধকারের মত ছেয়ে এসেছে।

এমন সময় হাসিমুখে ফিরে এল ফার্নান্দো। হাতে তার কতকগুলি গাছের ডালের মত মোটা আর কিম্ভুতকিমাকার 'সসেজ'। কিন্তু দেখেই মনে হল যে, অনেকক্ষণ থেকে খেতে না পেয়ে যে খিদেটা মরে গিয়েছিল, সেটা আবার জেগে উঠেছে। তারও ত একই দশা। আমাকে আমার ভাগ আগে দিয়ে তবে নিজে খেতে আরম্ভ করল। ওঃ, কোথায় লাগে এর কাছে আইসক্রীম বা ইটালিয়ান কেক। প্যারিসেও কোন দিন এমন সোয়াদের ও খিদে বাড়ানর মত কিছু খেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

খেতে খেতে বললাম, 'নন্দ, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি যে, যে আনন্দ তোমার মুখে ঝিকমিকিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে তা শুধু এই গেছো সসেজের কল্যাণে নয়। আরো কিছু আছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি না।'

আনন্দ ঢেকে রাখবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে সে বলল, 'ধরেছ

ঠিক, তুমি প্রায় ছাড়া পেয়ে গেলে। আশ্চর্য, ক'দিন ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহাড় চড়াই-উৎরাই করে কখন যে 'বাজতান' উপত্যকা ছাড়িয়ে এসেছি তা টেরই পাইনি। আর গ্রামের লোকদের ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করা যায় না। হয়ত অমনি দুশমনের আস্তানায় নিয়ে হাজির করবে।'

উদ্ধারের আশায় ততক্ষণে আমি অধীর হয়ে উঠেছি। কে শুনতে চায় তখন ভূগোল বা গ্রামের লোকের কথা! হাতের একটা ভঙ্গিতে ও কথাকে বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠলাম, 'কিন্তু, কবে, কখন ফ্রান্সে পৌঁছাব? কোন্ পথে? কখন?'

'অত উতলা হ'য়ো না, য়্যানি।' সে ধীরে ধীরে বলল। 'অত উতলা হ'য়ো না।'

সুখের দিনের সিনরিটা পোলা বিপদের মধ্যে কখন যে য়্যানিটায় পরিণত হয়েছিলাম তা খেয়াল করিনি। আপত্তি করতাম না, যদি বা খেয়াল করতাম। কিন্তু আজ কি মুক্তির পথ দেখতে না দেখতেই বিপদের দিনের বন্ধুর প্রতি এতটা বিমুখ হয়ে উঠেছি যে এতটুকু স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতাও নজরে পড়ল? কত দিন ত হাত ধরাধরি করে পাহাড়ে জঙ্গলে চলেছি। তার কাঁধের উপর ভর করে পাহাড়ী ঝরনা পার হয়েছি নুড়ির পর নুড়ির উপর পা দিয়ে। কই, তখন ত য়্যান, য়্যানি, য়্যানিটা এ-সব ডাকে আপত্তি করিনি। এমন কি খেয়ালও করিনি যে বিপদের মুখোমুখি হয়ে কত কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। শুধু কি তাই? তার ত কোন বিপদই ছিল না। নিজে যেচে সে আমার বিপদে এসে মাথা গলিয়েছে আমায় নিরাপদ দেশে পৌঁছে দেবে বলে। নিজের ছোট মনের জন্য নিজেকে ছি-ছি করলাম।

তবু বললাম, 'তাড়াতাড়ি বলো, নন্দ, কখন ফ্রান্সে পৌঁছাব?'

সে আবার ধীরে ধীরে বলল, 'আজ শেষ রাতে। এই পাহাড়টার উপর চড়লেই ওপারে পাব একটা ছোট ফরাসী গ্রাম। সেখান থেকে শুরু হবে তোমার মুক্তি। বোর্দোতে যে ব্যাঙ্কে তোমার টাকা আছে তা সেখানেই আনিয়ে নিতে পারবে। কোন গোলমাল হলে হয়ত ব্রিটিশ কনসাল তোমায় সাহায্য করবে। কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলা তুমি ঘুমিয়ে নাও। শেষ রাত থেকে শুরু হবে শেষ যাত্রা।'

অনেকক্ষণ খিদে চেপে রাখার পর অনেক খাওয়ায় দেহ ও মন হয়রান হয়েছিল। একটা গাছের দু'পাশে আমরা দু'জন চুপচাপ করে শুয়ে আছি। কিন্তু ওই কথাটা থেকে থেকে আমার মনকে এমন নাড়া দিয়ে যাচ্ছে যে, সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন সে ধাক্কায় নড়ে উঠেছে। —'শেষ রাত থেকে শুরু হবে শেষ যাত্রা।'

চুপিসারে একবার ফার্নান্দোর দিকে তাকালাম। তারও মনে একটা অস্বস্তি খেলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। সামান্য একটা গাছের তফাতে আর এটুকু বুঝতে পারব না? আজ ও যদি মাদ্রিদে থাকত, আর আমি থাকতাম মার্সেল্সে, তবু ত বুঝতে পারতাম।

এতক্ষণ ধরে গেল ক'টা দিন কেমন করে গেছে তার স্মৃতি যেমন ভাবে মনকে পেয়ে বসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে সামনের দিনগুলি কেমন ভাবে যাবে তার ভাবনা মনকে পেয়ে বসল। একা যেতে হবে— কেবল একা। কিন্তু শুধু আমি ত একা নই; সে-ও ফিরে যাবে একা।

ওর কথা ভাবতেই মন একটা করুণ বিষাদে ভরে গেল। যেন অনন্ত সমুদ্রে আমরা দুটি দ্বীপ ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় এসে থেমেছিলাম। তার পর আমায় দুঃখের ঢেউয়ে একা পাড়ি জমাতে দেখে নিজে থেকে সে আমার সঙ্গে ভাসতে শুরু করেছে অকূল দরিয়ায়। আজ পারের কাছে এসে হবে ছাড়াছাড়ি। তবু তার সঙ্গে কথা কইছি না।

খুব মৃদুস্বরে ডাকলাম—যেন ও ঘুমিয়ে পড়ে থাকলে ঘুম না ভাঙে, 'নন্দ !'

ও জেগেই ছিল। খুব অস্পষ্ট স্বরে সাড়া দিল, 'পোলা !'

খুশী হলাম না। আজই শেষ দিন, শেষ সন্ধ্যা, শেষ রাত্রি। আজ ত আমি পোলা নই—আমি য়্যানিটা, য়্যানি, য়্যান। যা খুশী আমায় ডাকো, শুধু পোলা বোলো না।

বললাম, 'নন্দ, তুমি আজ কত দূরে চলে গেলে—'

একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'না, আমি দূরে যাইনি, দূরই তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে।'

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, 'তুমি তো ইচ্ছে করলেই এই দূরত্ব পার হয়ে আসতে পার। এস না আমার সঙ্গে। আমার দেশে এস। আমার টিকিট বেচে থার্ড ক্লাসের দুটো টিকিট কিনবো। তুমি আমাদের দেশে সহজেই চাকরি পেয়ে যাবে।'

উঠে বসল ফার্নান্দো। দেখলাম, আনন্দের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই তার মুখে। তার মুখের বাদামী রঙ এই ক'দিনের রোদে ঘোর লাল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু ইটের মত সে রঙ বালির মত বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

সে বলল, 'তুমি কি মনে করো, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া উচিত হবে ?'

আমি। কেন হবে না ? নিশ্চয়ই হবে।

নন্দ। না, আমার দেশ আমায় ডাকছে। এ দুর্দিনে আমি ডেমোক্রাশি ছেড়ে, যুদ্ধ ছেড়ে বিদেশে যেতে পারি না। আর যদি সে সব না-ও হত, তবু বিদেশে আমি যেতাম না।

একটু খোঁটা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'বেশ, ভাল ত ! কলম্বস যে দেশ থেকে ভারত আবিষ্কার করতে বের হয়েছিল, সে দেশের লোকের উপযুক্ত কথা।'

মাথা নেড়ে সে বলল, 'না, আমি সে দেশেরই লোক। সেজন্যই তুমি—বিদেশিনী তুমি, তোমার দিকে আমার এত টান হয়েছিল। কলম্বস পোল্-স্টারের দিকে এমন একদৃষ্টে চেয়ে সাত-সাগরে পাড়ি দেয়নি, যেমন ভাবে আমি পোলার দিকে তাকিয়ে পথ চলেছি।'

বললাম, 'তোমার কথা শুনে বড় কৌতূহল হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে, আজকের শেষ দিনে জানতে—সেই প্রথম দিনে কি ভেবে তুমি আমার দরজায় টোকা দিয়েছিলে। তোমার মনে যেন ছাপ পড়েছে একটা আদিম য়্যাডভেঞ্চারের।'

ম্লান একটা হাসি সে মুখে টেনে আনল ; তারপর বলল, 'জানো, আমরা স্প্যানিয়ার্ডরা একটু আদিম জাতই বটে। বিশেষ করে নারী যেখানে জড়িত, সেখানে। ভালবাসি আমরা সারা দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই। আমরা আকাশের চাঁদ এনে প্রেয়সীর পায়ে লুটিয়ে দিই। সূর্যকে তার জ্বলন্ত চুল ধরে টেনে আনি। এই বিশ্ব নিখিলের সব কিছুর সঙ্গে উপমা দিয়েও আমাদের আশা মেটে না। তবু, জানো, আমাদের প্রেমের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে দেহ। আমাদের রোম্যান্স হচ্ছে প্রেমের রোমন্থন, রমণীয়তা নয়।'

একটু বিব্রত হয়ে বললাম, 'হোটেল আগিলারে পাশের ঘরের পেরুর মেয়েটির গীটারের মৃদু বাজনার তালে তালে যে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিল, সে-ও নিশ্চয়ই সেরকম হিস্পানী ছিল না।'

তার উত্তর শুনে আমি, ভারতবাসিনী, সীতা-সাবিত্রীর দেশের আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি আজ সব কিছুর জন্য তৈরী। সে বলল, 'নিশ্চয়ই ছিল। তুমি যখন স্পেনে এসেছ, আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্ভাণ্টেসের কেলেঙ্কারী পারিবারিক জীবনের কথা নিশ্চয়ই পড়েছ। অথবা কাল্দেরনের উপন্যাস নিশ্চয়ই পড়েছ। আমাদের চোখে নর-নারীর আদিম আকাঙ্ক্ষায়

কোন দোষই নেই, যদি গির্জা ভবিষ্যতে কোন দিন তাদের সম্পর্ক গড়ে দেয়।'

বললাম, 'কিন্তু আমাদের বেলা ত সেরকম কোন সম্ভাবনা ছিল না।'

'না থাকুক, তবু এগিয়ে যেতে দোষ নেই। আমরা হচ্ছি সারা পৃথিবী চষা জাত। এগিয়ে চলাই আমাদের ধর্ম। নারীর দিকেও আমরা অমনি করে এগিয়ে যেতে শিখেছি। হেসে খেলে ছ'দিন বেঁচে থাকাই হচ্ছে যথেষ্ট। আমরা যখন খেতে পাই না, তখনো মুখে হাসি লেগে থাকে। মেয়েরা যখন সাথিহীন হয়ে প্রাদো মিউজিয়ামের পথে ঘুরে বেড়ায়, অচেনা লোকের সঙ্গে ছু একটা উড়ো রসিকতা করতে ছাড়ে না। মোট কথা, হেসে খেলে নাও। ছ'দিন বই ত নয়।'

একটু রসিকতা করবার লোভ এখনো আমি ছাড়তে পারলাম না। বললাম, 'কিন্তু আমাদের ত আজ তৃতীয় দিন।'

বিষণ্ণ ভাবে সে বলল, 'আমার তেসরা দিন বহু দিন থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম কলম্বসের কৌতূহল ও হিস্পানীর প্যাসন নিয়ে। অগ্নিশিখা মনে হয়েছিল তোমাকে—পতঙ্গের মত ছুটে এলাম। কিন্তু দেখলাম, তুমি অগ্নির শিখা নও, শোভা। তুমি উজ্জ্বল, কিন্তু জ্বলো না। তুমি হিস্পানী নও, বিদেশিনী।'

প্রাণের আবেগে সে যেন আদি কবি বাল্মীকির মত শ্লোক সৃষ্টি করে গেল। ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'সে ত আমি প্রথম থেকেই ছিলাম।'

মাথা নেড়ে সে বলল, 'তা ছিলে। তবু আমাদের কাছে নারী চিরকালই নারী। আর পরনারীই হচ্ছে পরমা নারী। যে মুঠোর বাইরে, হাত বাড়াই তাকেই পেতে। নাগাল পাই না বলেই নিগড় গড়তে চাই। কিন্তু আমি রমণীর মধ্যে রোম্যান্স আবিষ্কার করলাম

যেদিন, সেদিন থেকেই তোমার সঙ্গে হল প্রকৃত পরিচয়। সেদিন থেকেই তুমি বিদেশিনী। আমার কামনা দিয়ে তোমায় কমনীয় করে তুলতে চাইনি সেদিন থেকে। আমার বেদনা দিয়ে তোমায় বরণীয় করে নিয়েছি।'

তার পর চুপ করে রইল সে। ধীরে ধীরে কখন একটা তারা পীরেনীজের একটা চূড়া থেকে আর একটার পিছনে আশ্রয় নিয়েছে জানি না। শুধু জানি যে, নন্দর নীরবতা নির্জন রাত্রিটাকে যেন রহস্যে ঢেকে রেখেছে। আমিও চুপ করে রইলাম।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে সে আবার বলল, 'তোমার সঙ্গে দুঃখের ভিতর দিয়ে—বিপদের মধ্য দিয়ে চলে আসব এত দূর, শুধু সেইটুকুই ছিল আমার মনের সাধ। আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমাদের একসঙ্গে চলাকে কখনো জড়িয়ে তুলতে চাইনি। একদিন সোনার খনি লাভের আশায় আমাদের দেশ চেয়েছিল তোমাদের দেশকে খুঁজতে। আমি বিদেশিনীর মধ্যে খুঁজে পেলাম স্পর্শমণি। লোহা আমার সোনা হয়ে গেল। ওগো অজানা, ওগো বিদেশিনী!'

আর সহ্য করতে পারলাম না। বেরিয়ে আসা চোখের জল সামলাতে সামলাতে তার ওই শিল্পীর মত সুন্দর আঙুলগুলি তুলে ধরে বললাম, 'আর ব'লো না, বিদায়ের রাতে আর এমন করে ব'লো না। আমি জানি তোমাকে প্রথম দিন থেকেই। সেদিন রাতে ওই ট্যাঙ্গো নাচ আর সরাইখানার রোম্যান্স আমায় বর্ষার বানের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেত—শুধু তুমি যদি একটুখানি টানতে আমায়। হয়ত সেদিন আমি তারই প্রত্যাশায় নিজেকে তৈরী করে রেখেছিলাম। তবু আশ্চর্য হলাম তোমার শেষ উদাসীনতা দেখে। তুমি সেদিন আমায় বাঁধতে না চেয়ে যা বাঁধনে বেঁধেছ তার ইতিহাস কেউ জানবে না।'

বেদনাভরা কণ্ঠে সে বলল, 'না, না, তোমার মুক্তি চিরকালই বজায় থাক। সে মুক্তি মুক্তার মত চিরকালই আমার হৃদয়ে তুলে রাখলাম। তুমি থাকবে আমার স্বর্গের স্বপ্ন। মর্ত্তের মাটিতে নামিয়ে এনে তোমায় কখনো দেখব না।'

ক্ষতি কি হত তাতে? আমার অবস্থা ত সেই একই। আমি যে হৃদয় নিয়ে এদেশে এসেছিলাম, সে হৃদয় নিয়ে ত আর ফিরে যেতে পারব না। আজ শেষ রাতে পদে পদে পেছনে ফিরে তাকাব! কাল প্রাতে নিরাপদে সীমান্তের ওপারে আমায় ছেড়ে তুমি পীরেনীজের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। আমি কি তখন হাসিভরা ফ্রান্সের বাগানগুলির দিকে তাকিয়ে থাকব, না, এই জলভরা গিরিনদীগুলির শ্যামল তীরে তীরে বনের আড়ালে তোমার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে চলার কথা মনে করে আনমনে পেছনের দিকে পা ফেলতে চাইব? ওগো, বিদায় রাতে আমায় উতলা করলে তুমি এ কথা তুলে। তুমি বড় নিষ্ঠুর।

তার বিষণ্ণ দুটি কালো চোখ আমার মুখের উপর এসে স্থির হয়ে রইল। আমার প্রতি নয়, নিজের প্রতি করুণতায় ভরা তার চোখ দুটি। কলম্বস বোধ হয় এমনি ভাবে তাকিয়ে থাকত আমেরিকা আবিষ্কারের অভিযানে সমুদ্রের নীল নিদ্রা-নিবিড়তার দিকে চেয়ে চেয়ে।

তার নীরবতা যেন হাজার হাজার আগুনের শিখা ছড়িয়ে দাবা-নলের মত আমায় ঘিরে আসছে। বাস্তবিক কি মানুষ এই দেশের লোক? এবং মানবতাই হচ্ছে এদের দেশের সবচেয়ে বড় রহস্য। সেটাই বার বার ফুটে উঠেছে এদের কবিতায়, চিত্রকলায় ও স্থাপত্য-শিল্পে। ওরা ওদের সোনার যুগেও চিন্তা করে মরেনি। বেঁচে থাকার আনন্দের মধ্যে অনুভব করেছে, কাজে মেতেছে, প্রেমে মজেছে।

যৌবনের অমৃত ঢেলে ওরা জীবনে ফুল ফুটিয়েছে। অজানার টানে, সুদূরের সন্ধানে সারা বিশ্বকেই ওরা বিদেশিনী বানিয়েছে। ওর চোখে আমি আজ বিশ্বের সেরা বিদেশিনী। ওর প্রেমের মহিমায় আমি নিজেকে নূতন আলোকে দেখছি।

তার ঐ শিল্পীর হাত দুটি আবার ছুঁয়ে নিতে আমার লোভ হল। আমার হাত দুটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু তার হাত আমায় বারণ করে একবার উপরে উঠে আবার নেমে গেল। ধীরে ধীরে সে বলল, 'জানো, যাকে ধরা যায় না, পাওয়া যায় না, সে চিরকালই অকরুণ। চিরকালই নিষ্ঠুরের মত সে পিছু টানে। তবু ত সামনেই আমরা চলি, সামনেই তাকিয়ে থাকি। সর্বদাই। শুধু যখন ভোরবেলা তাঁবু তুলে নিয়ে যাত্রা শুরু করি—তখনই কে যেন পিছু ডাকে। কার ক্যাস্টিনেটের মাতাল ঝংকার যেন পায়ে পায়ে শৃঙ্খলের মত বেজে ওঠে। কিন্তু তার জন্য ত বসে থাকতে দেবে না কেউ। একটুক্ষণ বসে থেকে যে নিঃশ্বাস নেব, তারও উপায় নেই।'

হঠাৎ একটা মৃদু অথচ স্পষ্ট শিসের আওয়াজে চমকে উঠলাম।

সে বলল, 'ওই শোন, আমাদের আজকের পথ দেখাবার রাখাল ছোকরা শিস দিয়ে খবর দিচ্ছে। এখনি আমাদের রওনা হতে হবে। শেষ রাত পর্যন্ত দেরি করলে চলবে না বুঝতে পারছি।'

আমার বুকের তলায় লুকানো পিস্তলটা ঠিক আছে কি না একবার হাত দিয়ে দেখে নিলাম। নন্দ তার 'নাভাজো'টা কোমরে এঁটে বেঁধে নিল। হাত ধরাধরি করে দু'জনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম শিসের আওয়াজ লক্ষ্য করে। ভাববার সময় নেই, পিছু ফিরে তাকাবার অবসর নেই—শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ এখনি অস্ত যাবে।

প্রেম বা প্রেয়সী কারো কথাই ভাবছিলাম না।

বরং বলতে পারি যে, মনটা তখন একটু কমিউনিজমের দিকেই ঝুঁকছিল যেন। আমি সাধারণ ছা-পোষা মধ্যবিত্ত লোক—"পান্ত আনতে মুন ফুরায়, মুন আনতে পান্ত"। আমি বোম্বাই সহরের ব্যালার্ড পিয়ারে শখ করে হাওয়া খেতে আসিনি। শৌখিন রুমাল নেড়ে শৌখিনতর কোন বন্ধুর বিলাত-যাত্রাও নাটকীয় করে তুলতে আসিনি। নেহাত সমুদ্রের পার থেকে জাহাজ কেমন করে ছেড়ে যায় ও তখনকার মোটামুটি দৃশ্যটা কেমন হয় তাই দেখতে এসেছিলাম। জেটিবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বলেই আসতে পেরেছিলাম। না হলে কি আর আমায় ঢুকতে দেয়?

চোখের সামনে দেখলাম কত চোখ সজল হয়ে উঠল, কত চোখ সজল না হওয়া সত্ত্বেও দামী রুমালের ঘষা খেতে লাগল। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে স্টুয়ার্ড হেঁকে গেল, "ফ্রেণ্ডস্ য়্যাশোর, ফ্রেণ্ডস্ য়্যাশোর"—অর্থাৎ যাত্রীদের বন্ধুবান্ধবরা তীরে নেমে যাও। আবার অবাক্ হয়ে দেখলাম তাদের অনেকেরই চোখের জল বড় তাড়াতাড়ি যেন শুকিয়ে গেল। তারা নীচে জেটিতে নেমে এসে রঙীন কাগজের ফিতে উপরে জাহাজে ছুঁড়ে দিল। তাদের বন্ধু বা আত্মীয় যাত্রীরা ডেকের উপর রেলিংএ ভর করে ত্রিভঙ্গ হয়ে সে রঙীন ফিতে ধরে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না জাহাজ দূরে সরে যেতে যেতে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে।

তারপর? তারপর ত বজায় থাকবে শুধু রবিঠাকুরের সেই বন্ধনহীন গ্রন্থি।

তাই মনে মনে চটে একটু একটু কমিউনিস্ট হয়ে উঠছিলাম। কেন মিছেমিছি এত রঙীন কাগজের ফিতে খরচ করল শৌখিন বড়লোকের দল? বিলেতী শিক্ষা ও বিদেশী প্রথা এদেরকে হৃদয়হীন করে তুলেছে। তা না হলে ওরা ওই কাগজের পয়সাগুলি কুলীদের বকশিশ করে দিলেই ভাল হত। তা করে না বলেই আজ দুনিয়ার মজদুর বড়লোকের বিরুদ্ধে এত কাস্তে ও হাতুড়ির লড়াই চালাচ্ছে। আমিও এই কন্‌ফেট্টি খরচের প্রতিবাদে মনে মনে চটতে লাগলাম।

আমার অবশ্য নিরেমিষ লড়াই। আগেই বলেছি ছা-পোষা লোক আমি। ধনী-দরিদ্রের হাঙ্গামে আমি নেই।

জাহাজ ত বাঁশী বাজিয়ে হেলে-দুলে নাচতে নাচতে দূরে চলে গেল। ডেকে রেলিঙের পারে দাঁড়ান মূর্তিগুলি আর দেখাও যায় না। বিদায় দিতে আসা লোকরাও যে যার পথে চলে গিয়েছে। আমিও যেতাম। কেবল এই ফাঁকে একবার ভাল করে জেটির সবটা দেখে নিতে যা দেরি হচ্ছিল।

এমন সময় চোখ পড়ল একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের চোখের উপর। ভদ্রলোকের হাতের কমল হীরের আঙটির ঝকমকিকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর চোখের কোণে চকচকে জল। দামী রুমালের ঘষা খেয়ে বের হয়ে আসা কৃপণ জলবিন্দু নয়, অসহায় চোখের জল।

আমার দৃষ্টি যে তাঁর চোখের জলের উপর পড়েছে তা বুঝতে পেরে ভদ্রলোক একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মুখখানা তাঁর অপ্রস্তুত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে গিয়েও ম্লান হয়ে গেল। অথচ চোখের জল মুছে নিতেও পারলেন না। তাতে আমার নজর আরো বেশী করেই তাঁর দিকে পড়বে এই সংকোচ। ভদ্রলোকের অবস্থা বুঝতে পেরে আমিই অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

•আহা, বেচারী। হয়ত মনে কোন গভীর বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করছে। তার উপর আবার মনের ব্যথা ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা পাবেন কেন?

কিন্তু আবার তাঁর দিকে ফিরে তাকাবার লোভও সামলাতে পারলাম না। লুকিয়ে আর একবার এক চোখে দেখে নিতে গেলাম। লুকিয়ে যা কিছু করি তাই মজার—গোপন প্রেমের মত।

এবার তাকাতে গিয়ে কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। ভদ্রলোকও যেন আমার তাকানর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। চোখ তাঁর দিকে ফেরাতেই দেখি তিনিও আমারি দিকে তাকাচ্ছেন। এবার অপ্রস্তুত হয়ে যাবার পালা আমার।

কিন্তু সে অপ্রস্তুত ভাব থেকে উদ্ধার করলেন তিনিই। একটু এগিয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাবছেন বাবুসাহেব? আপনার কোন দোস্ত আজ বিলেতে চলে গেলেন নাকি?'

দোস্ত? তা উনি অবশ্য অন্য কিছু অনুমান করতে পারতেন না। যে রকম নির্বিকার মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তাতে বন্ধুর চেয়ে বেশী আপনজন কারো বিচ্ছেদ ব্যথা অনুভব করার কথা নয়। মনে মনে ভদ্রলোকের নজর করবার শক্তির প্রশংসা করলাম। মুখে বললাম, 'না শেঠজী, আমার কোন বন্ধু এই জাহাজে বিলেত যায়নি।'

'কেউ না? তবে অন্য কারো বন্ধু বা কাউকে বিদায় দিতে এসেছিলেন বুঝি?'

'না। এমনি বেড়াতে এসেছিলাম।'

'আপনার বরাত ভাল, বাবুসাহেব। রাম রাম।'

চলে যাচ্ছিলাম। এর পর আর কি-ই বা কথা হতে পারে?

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালাম। সত্যিই ত। এই ত এখানে একটা জীবন্ত নাটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। না হলে ঐ ভদ্রলোক,—দেখেই

বুঝতে দেরি হয় না যে, ব্যবসায়ী লোক, কড়া সিদ্ধ ডিমের মত, ঝানু নারকেলের মত রসহীন কারবারী লোক—আমায় সৌভাগ্যবান বলে যাচ্ছেন আমার কোন বন্ধু বিলেত যায়নি বলে? না; ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

'রাম রাম, শেঠজী। আপনি আমার বরাত ভাল বললেন কেন বুঝতে পারলাম না।'

এবার অপ্রস্তুত হবার পালা ওঁর। উনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি যে আমি এরকম একটা প্রশ্ন করে বসব। বুঝলে হয়ত ওই মন্তব্যটা করতেনই না। একটু কাচুমাচু করে বললেন, 'না, না, কিছু নয়। আমি এমনিই বলছিলাম।'

'না শেঠজী, আপনি এমনিই একটা কথা বলবার লোক নন। আপনার কথার দাম আছে। বোধ হয়—বোধ হয় কারো বিলেত যাওয়াতে আপনি আজ এই জেটিতে মনে কোন কষ্ট পেয়েছেন—তাই আমায় সৌভাগ্যবান বলছেন।'

এই ব্যাকুল সমুদ্রের তলায় যুদ্ধের সময় কত 'ডেপথ্ চার্জ' অর্থাৎ তলফোঁড় দেওয়া হয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু কোন ডেপথ্ চার্জেই যে এমন লোভনীয় বস্তুকে ঠুকে উপরে তুলে আনা হয়নি তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর হোটেলের ঘরে গিয়ে বসলাম। কোন্ হোটেলে তা বলবার দরকার নেই। ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা নিরীহ চেহারার ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। কিন্তু রুচি আর রূপো দুই-ই আছে।

ততক্ষণে সহানুভূতির ছড় তাঁর মনের বীণায় মৃদু গুঞ্জন তুলতে আরম্ভ করেছে।

বুঝতে পারছি যে আমি তাঁর সঙ্গে না এলে তিনি এই স্মৃতিতে জড়ানো সাজানো গোছানো ঘরে বিরাট একাকিত্বের বোঝায় হাঁসফাঁস

করতেন। আর আমি ত আসবই। মন আমার আবিষ্কারের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

একটু ইতস্ততঃ করে খানিকটা চুপ করে থেকে, দু-একবার কেশে নিয়ে মুরলীমনোহরবাবু পাঁচ বছর আগেকার জীবনে চলে গেলেন। মরুভূমি রাজপুতনার ভাগ্যান্বেষী যুবক বাংলাদেশের মাটিতে টাকার খনির খোঁজ পেলেন। অল্প বয়সেই তাঁর লোহার কারবার ফেঁপে উঠতে আরম্ভ করেছিল। যুদ্ধের গরমে লোহা আরো ফেঁপে উঠল—লাভ আকাশ ছুঁয়ে গেল। এবং তাঁর মনের বাসনাও।

বড়বাজার এলাকায় তা অনেক সময়েই হয়ে থাকে। রূপোর আমদানি যদি বেশী হয়, রূপও তখন পেছনে পড়ে থাকে না। সব দেশেই ব্যবসায়ীদের অনেকেই নীরস টাকা উপায়ের ধান্দায় ডুবে থেকে থেকে যখন নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকায় তখন দেখতে পায় শুধু শকুনির মাংস খুঁজে বেড়ানো। আমাদের মুরলীমনোহরবাবুও হয়ত সেই দিকেই চোখ তুলে তাকাতেন। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে ভাগ্য অন্যরকম লীলার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল।

তিনি ব্যবসার পর ব্যবসায়ে জিতে যেতে লাগলেন কলকাতায়। কোন জায়গাতেই তাঁর পথে আসেনি কোন বাধা। কিন্তু তিনি যদি শুধু এক রকমের যুদ্ধক্ষেত্রেই নজর রাখতেন তাহলে বোধ হয় তাঁর এমন হার হত না।

'শিরিন বেগমের নাম শুনেছেন, বাবুসাহেব?'—নিস্তব্ধ ঘটনা যেন হঠাৎ চমকিয়ে উঠল। 'না, শোনেননি তা আমি জানি। কারণ সে সিনেমার অ্যাকট্রেসও নয়, সাধারণ বাজারের মেয়েও নয়। তার নাম শুনবেন শুধু আমাদের শৌখিন ধনী মহলের নিজেদের আলাপের মধ্যে। অন্য লোকের নাগাল অত উঁচুতে পৌঁছায় না।'

মুখে বোধ হয় একটু চাপা হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল। মনোহরবাবু বলে উঠলেন—এ গল্পের পক্ষে ওর নাম মনোহর দিলেই যথেষ্ট হবে—'না, না, বাবুসাহেব আপনি যা ভাবছেন তা নয়।'

ঠাট্টাকে চকিতে চেপে নিয়ে বললাম, 'কি ভাবছি তা না জেনেই কিন্তু আপনি বলছেন যে—আমি যা ভাবছি তা নয়।'

'না, না, আপনার মনে একটু ঘৃণা আসতে আরম্ভ করেছে, সেজন্যেই আপনি মুখ ওরকম করে নিয়েছেন।'

'না, না, শেঠজী, আমার মনে কোন ঘৃণাই নেই। আমি খুব সাদা মন নিয়ে আপনার কথা শুনে যাচ্ছি। আপনি বলে যান, আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

মুগ্ধ ভাবে মনোহরবাবু বলে চললেন, 'আপনার ত কৌতূহল হবেই সাহেব। আমার নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছে, নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে দেখি কেমন করে এরকম একটা ব্যাপার সম্ভব হল।'

'কি ব্যাপার, শেঠজী—' খুব মোলায়েম সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করলাম।

'জানেন মশায়, আপনি শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক। আপনি আমার কথার মানেও বুঝতে পারবেন, মানও দিতে পারবেন। আমি গিল্টির বাজারে ফাটকা খেলতে এসেছিলাম। খাঁটি সোনা মিলে গেছে আমার বরাতে।'

(২)

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এর নজীর আছে। বারনারীকে বরনারী বলতে বাধেনি সংস্কৃত কবির। আর বৈষ্ণব কাব্যে ত পরনারীই হচ্ছে পরমা নারী।

অবশ্য কালিদাসকে বুঝতে গেলে যেমন মল্লিনাথের দরকার,

তেমনি এ তথ্য বুঝতে গেলে প্রেমতত্ত্বের প্রয়োজন। আমাদের সংসারের সীমানায় রোজকার জীবনে যে প্রেম বা অনুভব দেখতে পাই তার হিসাবে এর কোন সম্মানই নেই।

কিন্তু তবু যখন দক্ষিণ বাতাস নায়কের মনকে সংসারের সীমার বাইরে উন্মন করে নিয়ে যায়, ফুলে ফুলে ভরা কুঞ্জে যখন ভুলে যাওয়া যৌবন জ্বালাময় হয়ে জেগে ওঠে, তখন সংস্কৃত ভাষার মহিলা কবি পর্যন্ত রেবানদীর পারে বেতসীতরুতলে প্রাণ যার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে বলে অনুভব করেন, তাকে যে শুধু মন্ত্র পড়ে বিয়ে করা স্ত্রী বা স্বামী হতেই হবে, সে কথা সংস্কৃত সাহিত্য বলে না। গৃহবাসিনী না হলেও বসন্ত সফল হয়ে উঠতে পারে, যদি থাকেন বসন্তসেনা।

মুরলীমনোহরবাবু এমনি একটি বসন্তসেনার বাঁধনে ধরা পড়লেন। টাকা যাঁদের প্রচুর আর রুচিও ভাল, তাঁরা পঞ্চশরের ছাই খুঁজবার জন্য যথেষ্ট দাম দিতে পারেন। মনোহরবাবুর মত রসিক লোকরা পঞ্চশরের পোড়া ছাই যাদের মধ্যে খুঁজে বেড়ান তাদের সাধারণ নাম বাইজী। কিন্তু সংস্কৃতে তাদের নাম দেওয়া যায় বসন্তসেনা।

অন্তত শিরিন বেগম সম্বন্ধে এ নাম নিশ্চয়ই দেওয়া চলে। মনোহরবাবু অবশ্য সংস্কৃত কাব্য পড়েননি। বসন্তসেনার কথাও তাঁর জানবার কথা নয়। কিন্তু তার বর্ণনা শুনে কেবলি মনে হতে লাগল যে—গানে, নাচে, রসালাপে, মন মাতানোর কারবারে শিরিন বসন্তের হিল্লোল বইয়ে দিতে পারে। শুধু অল্পেতেই সন্তুষ্ট একটি মরুভূমির মনে নয়, অনেক ওস্তাদ রসিকজনের মনেও। মোট কথা, শিরিনের চারুকলা মনোহরবাবুর মনোহরণ করে রেখেছিল—বললেন তিনি।

শুধু তাই যদি হত তাতে এমন কিছু যেত আসত না। বহু বড়-লোকের ঘরে এমন হয়েই থাকে। বহু পুরুষসিংহেরও জীবনে চাঁদের

কলঙ্কের মত শোভা পেয়েছে অসামাজিক প্রেম। পেরিক্লিসের গৌরব কি এ না থাকলে এত বেশী ফুটে উঠত? নেলসন কি ট্রাফালগারের যুদ্ধ জিততে পারতেন লেডি হ্যামিল্টনের প্রেরণা না পেলে? প্রেয়সীই ত দেয় প্রেরণা, দেয় প্রাণশক্তি।

অবাক্ হয়ে যাবার কথা। লোহার কারখানার কোটিপতি মাড়োয়ারীর মনের কথা ত এসব নয়। তবে মনোহরবাবু এসব শিখলেন কোথা থেকে? এবং কার কাছ থেকে?

যখনি তিনি বলেছিলেন যে, গিণ্টির বাজারে ফাটকা খেলতে এসে খাঁটি সোনার খোঁজ পেয়েছেন—তখনি বুঝেছিলাম যে তিনি প্রেমের ভাষায় কথা বলছেন, পড়ার ভাষায় নয়। তাঁর বর্ণনায় যখন পেরিক্লিস আর লেডি হ্যামিল্টনের উদাহরণ এসে গেল তখন বুঝলাম যে, শুধু প্রেমের ভাষা নয়, প্রাণের ভাষায় কথা কইতে তাঁকে শিখতে হয়েছে। প্রাণ, অন্ততঃ মান নিয়ে টানাটানি পড়ে গিয়েছিল বলেই বোধ হয়।

সে কথা নিজেই বললেন তিনি। যতদিন শিরিন ছিল তাঁর ক্ষণ-বান্ধবীদের একজন, তাতে বাড়ীর কারো কোন আপত্তি হয়নি। ঘাটে ঘাটে নৌকো ঘুরে বেড়ালে কোন লোকসান নেই। শুধু কোন একটা বিশেষ ঘাটে বাঁধা না পড়লেই হল। মনোহরবাবুর সংসার আছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা কারবার সবই নিশ্চিন্তভাবে আছে, কারণ সময়মত তারা সকলেই তাঁর মনোযোগ পাবে। নৌকোর হাল গৃহিণীর হাতেই আছে, তাই দাঁড় বেয়ে যদি তিনি এদিক ওদিক নৌকো নিয়ে যান এতটুকুও কোন লোকসান নেই। অবশ্য যতক্ষণ না দাঁড় ভেঙে যায় বা নৌকো চড়ায় আটকিয়ে যায়। গোলমাল বাধল যখন শিরিনের বালুচরে এসে নৌকো আটকিয়ে গেল এবং মরুভূমির দেশের মনোহর মাঝি মন সঁপে দিলেন সেই বালুচরেই। নিশ্চিন্তভাবে

সেখানেই মৌরসীপাট্টা গাড়লেন। নৌকোর নঙ্গর বেঁধে বসে রইলেন সেখানেই।

'ক্ষতি তাতে কি হয়েছিল সংসারের ?'—মনোহরবাবু চোখ মেলে আমার উত্তরের প্রত্যাশায় রইলেন। তিনি ত সে নৌকোর চলাচলে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করেননি। সংসার ঠিকই চলছিল ; কারবারের উন্নতিই হচ্ছিল। স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যেও দেননি ঢিলা। শুধু তাঁর মন দিয়েছিলেন একটি ললিতকলায় ওস্তাদ তরুণীকে। তার সঙ্গ পেয়ে একটি মরুর দেশের মন হয়ে উঠেছিল সরস আর জীবন খুঁজে পেয়েছিলেন বেঁচে থাকার মাঝে। যুদ্ধের বাজারে নতুন নতুন ব্যবসায়ে হারজিতের খেলায় তিনি নেমেছিলেন শুধু শিরিনের কাছে পাওয়া মনের বলের জোরে। সে খেলায় তিনি যে শুধু জিতেই চলেছেন, তারও মূলে শিরিনের প্রেরণা। লাভ তাঁর যা হয়েছিল তার তুলনায় প্রতিদানে তিনি সামান্য দামই দিয়েছেন এই তরুণীকে।

মনে মনে প্রশংসা না করে পারলাম না। লক্ষ্মীর বরপুত্রদের এ রকমই হয়ে থাকে। মন দিয়ে তার বদলে পেলেন মালা নয়, জ্বালা নয়, ধন—আরো ধন।

মধ্যবিত্তের আধমরা মনের কোন একটা কোণে বোধ হয় সমালোচক সর্বদাই লুকিয়ে থাকে। সে জেগে উঠে আমায় মনে করিয়ে দিল যে, বাঁচতে যদি চাও, এমনি করেই বাঁচতে চেষ্টা করো। প্রাণরক্ষা করবার জন্যে চাই প্রেরণা। দেখ, এই ভদ্রলোক কেমন প্রেরণাকেও প্রাণধারণের কাজে লাগিয়েছেন। মোটা কথায় মোটমাট মনে হচ্ছে এই যে, বাইজীর পেছনে তিনি যে টাকা খাটিয়েছেন তাও খুব মুনাফা দিয়েছে।

মনোহরবাবুর মানস পানসী কিন্তু টলমল করে উঠল। সংসারের

আকাশে উঠল ঝড়, নদীতে জাগল কালো ঢেউ। কারবারের কাছিতে মড়মড় করে টান পড়ল। সবার উপরে তাঁর সমাজে বইল তুফান।

বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। প্রথমে মনোহরবাবুর স্ত্রী আপত্তি তুললেন। বললেন, 'ও মেয়েটিকে ছাড়। কেন, আর কি কোন মেয়ে নেই সংসারে? বি কো মুহবাঢ়ো। ছনিয়ামে ঔর ঘনি রাঁণ্ড বস্ হ্যায়।'

মনোহরবাবু স্ত্রীর কাছ থেকে এই রকমের আপত্তি আশা করেননি। ভয় ছিল যে, কোনদিন আপত্তি উঠবে তাঁর বারমুখো হওয়ার জন্য। কিন্তু যে দেশে লক্ষহীরার গল্পে আছে যে, স্বামীর খুশির জন্য স্ত্রী নিজে পিঠে করে তাকে বেশ্যার কাছে নিয়ে গিয়ে রেখে আসে, সে দেশের সনাতনী সহধর্মিণী সেজন্য স্বামীর উপর রাগ করেননি। মনে নিশ্চয়ই দুঃখ, এমন কি রাগও হয়েছিল। কিন্তু জোর করে কখনো বারণ করেননি। প্রথম বারণ করলেন যখন দেখলেন যে, স্বামীর মন গেঁথে গেছে একটি বিশেষ জায়গায়। মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়ালে ক্ষতি নেই; শুধু মধুতে জড়িয়ে আটকিয়ে না গেলেই চলে।

মনোহরবাবু প্রতিবাদ করে বললেন, 'কেন ছাড়ব? ওর জন্য কি আমি তোমাকে অবহেলা করেছি, না দেখাশোনা করি না, না কারবারে লোকসান দিয়েছি?'

এর উত্তরে গৃহিণী অনেক কথা বলতে পারতেন; কিন্তু সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের পাঠ তাকে কেউ দেয়নি। মনোহরবাবুকেও দেয়নি, কিন্তু বাইরের সংসারে এসে অনেক সূক্ষ্মতা শিখেছেন তিনি। জীবনের স্কুলঘরে হয়েছে তাঁর শিক্ষা, পুঁথির পাতা থেকে নয়।

গৃহিণী তবু আপত্তি করলেন। বললেন, 'কেন, শিরিন ছাড়া কি

আর বাইজী নেই কলকাতায়? যাও না অন্যদের কাছেও? শুধু এক জায়গা ছাড়া কি অন্য কোথাও তোমায় ঢুকতে দেয় না?'

পৌরুষে আঘাত করে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলেন বোধ হয় মনোহর জায়া। কিন্তু তাতে বিফল হলেন।

মৃদু হেসে স্বামী বললেন, 'সারা দুনিয়ার দরজাই ত খোলা রয়েছে রূপিয়ার কাছে। যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারি, কিন্তু যেখানে-সেখানে যে যাই না, তাতে ত তোমার খুশী হবারই কথা। আমি যে ভাল লোক, তার কত বড় প্রমাণ বল ত?'

অগ্নিশর্মা হয়ে গৃহিণী বললেন, 'থে ভালা আদমী হো? যদি থে ভালা আদমী হো তো এক রাঁণ্ডকে ঘরকো পড়নাক নি যাতা?'

রাগের চোটে তাঁর নাকের নথ ও কানের 'সুরলিয়া পাতি' ঝলমল করে উঠল। হাতের মোটা-মোটা 'বাংড়ী' আর 'পাছেলী' দামী ঝংকারে যুদ্ধ-ঘোষণা করে উঠল।

তাতেও দমলেন না বা চটলেন না মনোহরবাবু। শিরিন কথার মানে হচ্ছে মিঠে। শিরিনের সুরভি যার মনকে মিঠে করে রেখেছে, মুখ তার ত তেতো হতে পারে না। মিষ্টি হেসে তিনি বললেন, 'আমি যদি বাজে বাজে বাইজীদের কাছে যাই তাহলেই কি ভাল লোক হয়ে যাব? তুমি কেন বোঝ না যে, আমার যদি দুটো বিয়ে থাকত তাহলে ত আমায় কেউ দুষতে পারত না।'

গোলমালটা ত সেখানেই। বাইজী, বাইজী থাকুক; বিয়ে-করা বৌ যেন না হয়ে উঠে। সমাজের সীমানার বাইরে থেকে সে শুষতে থাকুক, কিন্তু সম্মানের সিংহাসনে যেন সে এসে না বসে। তাহলেই শাসনে থাকবে সমাজ, পড়বে না তাতে টান।

'থে ডুব গ্যা কালিধার। এংরেজী পড়েড়া ফ্যাসনবাজা স্তে ভি গয়া বিতা হো গ্যা'—তুমি জাহান্নমে গেছ, ইংরেজী পড়া ফ্যাসন-দুরন্ত

বাবুদের চেয়েও তুমি বদ—এই বলে রাগে কাঁদতে কাঁদতে রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মনোহর-মহিষী। বেচারীর 'স্থরলিয়া পাতি' কানের দু'পাশ থেকে অসহায়ভাবে দুলতে দুলতে চলে গেল।

(৩)

গোলমাল কিন্তু এখানেই থামল না। গিন্নীর মুখ ভার। ছেলে-মেয়েরা দূরে সরে গেল। আত্মীয়স্বজনের কানাঘুষো শুরু হল। কিন্তু কিছুতেই মনোহরবাবুকে দমাতে পারল না। বরং তিনি এসবের জন্য বিব্রত হয়ে আরো বেশী করেই শিরিনের দিকে ঘেঁষে গেলেন।

শিরিন অনেক মানুষের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তারও শিক্ষা হয়েছে জীবনের পাতা থেকে, কাগজের পুঁথি থেকে নয়। সে ভাল করেই বুঝল যে, মনোহরের নৌকার গুণ-স্থুতোয় টান পড়েছে। এখন তাকে দিতে হবে সহানুভূতি, যাতে সে আরো বেশী করে তার দিকে মজে থাকতে পারে, আরো ভাল করে সংসারের মুশকিলগুলি ভুলে থাকতে পারে। তার গানের ও নাচের মজলিস আরো বেশী করে জমে উঠল। মনোহরবাবুর গঙ্গার ধারের বাগানবাড়ীর শনিবারের জলসাগুলি চলতে লাগল আরো বেশী করে, আরো বেশী রাত্রি পর্যন্ত।

বসন্তসেনা শুধু পঞ্চশরে সাজেনি, পেটে বিদ্যাও আছে। তা না হলে এ যুগে এ বিদ্যা অচল। ফরাসী বসন্তসেনারাও শিক্ষিতা ও মার্জিতরুচি বলে স্থনাম আছে। চমকিয়ে উঠলাম যখন মনোহরবাবু বললেন যে, শিরিন কলকাতার বি. এ. পাস।

অথচ তাঁর নিজের ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে শুধু কলেজ স্ট্রীট দিয়ে কারবারের কথা বলতে বলতে মোটরে চড়ে ধেয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তার চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কোন প্রয়োজন ছিল না।

একটু অবাক্ হবার ত কথাই। গ্রাজুয়েট শৌখিন প্রজাপতিকে কে শুকনো কিন্তু দামী শালগাছের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে কল্পনা করতে পারে?

কিন্তু সে সম্বন্ধ যে কত নিবিড় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ হয় যে ঘটনাতে, সেটাই এই নতুন রকমের নাটককে পঞ্চমাঙ্কের দিকে টেনে আনল। মনোহরবাবু বিয়েটা সাধারণ মাড়োয়ারী নিয়ম মতেই ছেলেবেলায় সেরে রেখেছিলেন। তাঁর প্রথম মেয়ের বিয়ের সভাতে চতুর্থাঙ্কের যবনিকা উঠল।

ধনী মাড়োয়ারী মেয়ের বিয়ে। রাতের রোশনাইয়ের মধ্যে বিলেতী বাজনার তালে তালে ছবির মত সাজানো ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল 'রোলী' (কুঙ্কুম) মাখানো 'শেওড়ায়' (ঝালরওয়ালা সোনালী মুকুট) আধো ঢাকা বালক-বর। বীরবেশী বালক-বরকে পিঁড়ির উপর আরতি করে নিলেন মনোহর-জায়া। রূপোর থালায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে একটা কর্পূরের প্রদীপ। বরের পেটে বাঁধা নারিকেলটির উপর এসে পড়ছে সে প্রদীপের আলো। এমন সময় আরো একটি আলোর শিখা বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। মনোহর-জায়ার চোখে কিন্তু ফুটে উঠল একটা ভীত আর অসহায় ভাব। মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন এই প্রদীপের দিকে। এটি হচ্ছে 'বরাত' বিয়ের উৎসব। বরপক্ষের কোন মহিলার বরযাত্রী-দলের সঙ্গে এরকম ভাবে আসার কথা নয়। সকলেই চম্‌কিয়ে উঠে চারদিক থেকে এগিয়ে এল। কি ব্যাপার! কোন আধুনিকা বাঙালী মহিলা এলেন নাকি কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণে?

না, কারো চিঠিতে বা মুখের নেমন্তন্নে তিনি আসেন নি। কোন সমাজশাস্ত্রের বা প্রত্নতত্ত্বের ছাত্রীও নন। মনোহর-জায়া ততক্ষণে সামলিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে নিজের দাবি রক্ষা করবার জন্য মরিয়া হয়ে

চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'রাঁগু আইয়ে, কুন্ বুলান গয়োহো ইন্‌নে। কোইকে শুভকাম্‌মে আ রাঁগু তো বাধ্ গেরনা আই গি। কারো রাঁগুো আঠেসা।'

মানে খুব পরিষ্কার। বিশেষতঃ মনোহরের একটি নারীবিশেষের প্রতি টানের কথা সমাজে কারো অজানা ছিল না। এ নিয়ে রাগ, চুকলি আর সমালোচনার অন্ত ছিল না। আগুনে ঘিয়ের ছিটে পড়ল, যখন সকলের সামনে দিয়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন মেয়ের বাপ মুরলীমনোহরবাবু নিজে 'শিরিন শিরিন' বলে।

শিরিন ততক্ষণে ছুটে বাইরে দূরে দাঁড়ানো মোটরে গিয়ে উঠে বসেছে। মনোহর পাগলের মত তার হাত ধরে বলে উঠলেন, 'তুমি, তুমি কেন এখানে এসেছিলে ?'

ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে হেসে শিরিন বলল, 'তুমি ত নেমন্তন্ন করতে পার না। তবু এলাম। তোমার মেয়ের বিয়ে, আর আমি না এসে কি করে থাকি। অন্ততঃ দূর থেকে ত দেখে যাই।'

'তবে তবে, ভিতরে এসো একবার। আমার বাড়ীতে তোমার পায়ের ছোঁয়া দিয়ে যাও।'

'ছি, তা কি কখনো সম্ভব হয় ? তোমার ঘর ত আমার কাছে স্বপ্ন। তা থেকে আমি চিরকাল বঞ্চিত। তুমি আমার; কিন্তু আমি ত তোমার গৃহিণী নই। আমার ত কোন অধিকার হবে না কোন দিন।'

'তবু, তবু একবার এসো।'

'ছি, তুমি সমাজ ভুলে যাচ্ছ, কিন্তু পাগলামি ক'রো না। তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। ড্রাইভার, স্টার্ট দাও।'

সমাজ কিন্তু ওকে ভুলল না।

মুখে ঘন আঁধার নিয়ে ফিরে এল মনোহর। কিন্তু সমাজের কর্তারা ছেড়ে কথা কইলেন না। প্রেমচন্দজী জটিয়া হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'তেরে কোই প্রকার কি ইজ্জত নহি হ? যিকো আদমি সাদি সুদা ওর বালবচ্চা ওয়ালা হোতো হুয়ে ভি অগর এসতরহ এক মুসলমানী বাইজীসে ইসতরহ্‌কে গৈর ওয়াজীর সমন্ধ রাখনা সকহ উন সমাজন মুহ্‌ নহি দিখানা চাহে।'

মানে অত্যন্ত পরিষ্কার। সহজ সরল মাড়োয়ারী ভাষায় ওঁরা সবাই মনোহরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সমাজে বসে যবনীর সঙ্গে নিয়মিত প্রেম করা চলবে না।

হরদয়ালজী সমঝিয়ে দিলেন ওই একই রকম কথা, কিন্তু আরো স্পষ্ট করে।

বরপক্ষের নাথুরামজী মহাবিক্রমে বরকে উঠে যেতে হুকুম দিয়ে হেঁকে উঠলেন।

বিয়ে ভেঙে যায়-যায় আর কি! অন্দরমহলে মহা গণ্ডগোল; বারমহলে বড় বিশৃঙ্খলা। সমাজ-সংস্কারক কয়েকটি আধুনিক ছোকরা চেষ্টা করতে লাগল যাতে বিয়েটা কোনরকমে হয়ে যায়। এমন কি তারা কয়েকজন সমাজের মাথার অতীত ইতিকথারও ইঙ্গিত দিতে বাকী রাখল না। তারা দেখিয়ে দিল যে, এসবে কোন দোষ তাদের হয়নি, হয়েছে শুধু মুরলীমনোহরবাবুর, কারণ তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে আজ। বুড়োরা অমনি প্রতিবাদ করে উঠলেন যে, ঐসব প্রবীণ ও প্রধানরা আর যাই করে থাকুন সমাজ ও জাত বাঁচিয়ে চলেছিলেন। বাগানবাড়ীর নাচ গান আর কেলেঙ্কারিকে অন্দরমহলে পাকাপাকি করে টেনে আনতে যাননি কোনদিনও।

মনোহরের উত্তর দিবার ছিল না কিছুই। মেয়ের বিয়ে, বংশের সম্মান, নিজের সমাজে প্রতিষ্ঠা সব একদিকে; আর শিরিন আর-এক

দিকে। কাকে ছাড়তে হবে তার নির্দেশ খুব স্পষ্ট, অথচ কোন্ প্রাণে তা মানবেন ?

বংশ, পরিবার, ইজ্জত এরা আজীবন থাকবে। চিরকালের জন্য বাঁচিয়ে চলবার সামগ্রী। উদয়াস্ত এদের জন্যই লোকে পথ চলে, তাঁবু বাঁধে, নীড় রচনা করে। হয়ত অনেকেরই ঘরে আছে শুধু আরাম বিরাম ও বিশ্রাম, নেই সুখ শান্তি ও সহজ ভাব। সম্পদ আর সম্মানের সীমা নেই, কিন্তু ভুবন তার অন্ধকার। দিন ভরে থাকে কাজে, কিন্তু রাঙা সন্ধ্যা নিয়ে আসেনা মনের মানুষের পরশ।

সমস্যার সমাধান আর নিজেকে করতে হল না। দূর থেকে মনোহর দেখলেন যে, স্ত্রী হরপিয়ারী ঘোষণা করছেন: 'আমার মেয়ের বিয়ে আপনারা সম্পন্ন করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, ওই বাইজী এর জীবন থেকে চিরকালের মত চলে যাবে, যাবে, যাবে—।'

(৪)

শিরিনের সুন্দর টানা-টানা চোখ থেকে একটি বিন্দু জলও সেদিন ঝরে পড়েনি বিয়ে-মণ্ডপে। নয়নে বাণ ছিল না, ছিল বাণী।

সে বাণীও হারিয়ে গেল, যখন কয়েক দিন পর সে গোপনে মনোহরবাবুর এক এটর্নি বন্ধুর অফিসে এসে হাজির। বন্ধু তার নাম শুনেছিলেন, খবর পেয়েই তাকে খাস কামরায় নিয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'মিস্ শিরিন বেগম, ব্যাপার কি ?'

শিরিন বেগম একটিও কথা বলতে পারল না। অশিক্ষিতা নয় যে কথা হারিয়ে যাবে, অনভ্যস্তা নয় যে ভড়কিয়ে যাবে। তবু, তবু মুখ নীচু করে রইল অনেকক্ষণ।

বার বার কোন মহিলার দিকে তাকান যায় না। এটর্নি ভদ্রলোক বন্ধুর বান্ধবীকে খুলে জিজ্ঞেস করতেও সংকোচ বোধ করতে লাগলেন। কলকাতা হাইকোর্টের ছায়ার তলায় একটি অফিস এটর্নি-মক্কেলের কথাবার্তায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। শুধু শিরিনের মনের কথা মুখে ফুটে বের হচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত এটর্নিকে চম্‌কিয়ে দিয়ে শিরিন জানাল যে, সে তার সব সম্পত্তি অর্থাৎ দুখানা কলকাতার বাড়ী মুরলীমনোহরবাবুর নামে লিখে দিতে চায়।

এ। সে কি কথা, বেগমসাহেবা। মাপ করবেন, আমি কি ভুল শুনলাম? মনোহরবাবু দুখানা বাড়ী আপনার নামে লিখে দিতে চান, এই কথা বলছেন ত?

শি। না, না, আমি লিখে দিতে চাই আপনার বন্ধুকে।

এ। সে কি কথা? আপনি কি ঠিক ভেবে দেখেছেন যে আপনি কি বলেছেন? আপনার চলবে কি করে?

শি। আমার চলার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না। আমি চালিয়ে নেব। ঠিক পারব।

এ। তা আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। কিন্তু এতদিনের জমানো সম্পত্তি আপনি ছেড়ে দেবেন কেন? আর, কাকেই বা দিচ্ছেন? আপনি ত ওগুলি শুধু মুরলীমনোহরের কাছে পাননি যে, যার ধন তাকেই ফেরত দিয়ে দেবেন।

শি। না, তা ঠিক নয়। তবু আমি তাকেই দিয়ে যেতে চাই। কেন যে ওকেই দিয়ে যেতে চাই দয়া করে তা বুঝবার চেষ্টা করবেন না।

এটর্নি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তা অবশ্য আপনি যে কারণেই হোক যাকে খুশী দিয়ে যেতে পারেন। আমার জিজ্ঞেস

করবার কোন অধিকার নেই। তবু আইনমতে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়। আর তা ছাড়া মনোহরবাবু আমার বন্ধুলোক। তাঁকে না-জানিয়ে তাঁকে এরকমভাবে একটা দানের অধিকারী করে দেওয়া হবে—সেটা আমার ত তাঁকে জানান উচিত।'

শিরিন ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, 'না না, স্যার, আপনি তাকে জানাবেন না। অন্ততঃ আমি যে ক'দিন এদেশে আছি তত দিন নয়। তারপর যা খুশী করতে পারেন। আমার এই জীবনের শেষ চিহ্নটুকু তাকেই দিয়ে নতুন জীবনের পথ খুঁজে চলে যাব।'

একেবারে তাজ্জব ব্যাপার। এই রূপসী তরুণী তার রূপের দামে উপায় করা সম্পত্তি শুধু যে তার একজন অনুগ্রাহককে দিয়ে দিতে চাইছে তা নয়। আবার দেশ ছেড়ে চলে যাবে। ব্যাপারটা বড় কিরকম হয়ে উঠল। এটর্নি শিরিনকে একটু বসতে বলে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে টেলিফোন তুলে ধরলেন।

নেতাজী সুভাষ রোড থেকে তখনি মনোহরবাবু ছুটে এলেন। ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন তিনি বন্ধুর খাস কামরায়। চেপে ধরলেন শিরিনের হাত। একটু কেশে যেন সিগারেটটা ধরাতে সুবিধা হচ্ছে না এই ঘরে, এরকম একটা ভাব করে বন্ধু বের হয়ে এলেন ঘর থেকে।

মনোহরবাবু সম্পত্তির কথা কানেই তুললেন না। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বিদেশে চলে যাবে? কোথায় যাবে? কেন যাবে? আমাকে বলনি কেন?'

শি। আমার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল বিলেত যাব, সেখান থেকে পাস করে এসে স্বাধীন কোন কাজ করব।

ম। তোমার এ কাজও তো খুব স্বাধীন।

শি। (হাসবার চেষ্টা করে) হ্যাঁ, খুবই স্বাধীন। 'ভিজিটারে'র মন ভিজিয়ে চলতে চলতে কোথায় কখন পিছলিয়ে যাই তার ঠিক

নেই। আমাদের কি নিজের বলে কিছু আছে? এমন কি ইচ্ছাটুকুও!

ম। রাম রাম, শিরি। তোমার কোন্ ইচ্ছা ঠিক থাকেনি? আমি কি একদিনও একবারও তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেছি।

শি। তা গত বছর দুয়েক সম্বন্ধে সে কথা ঠিক। আমি ত তবুও এ কথা ভুলতে পারি না যে, আমার নিজের কোন সত্তা নেই। আমাকে ঢেকে আছে আমার ব্যবসা। সবটাই আমার দোকানদারী। খদ্দেরের পছন্দমত দোকান সাজাতে হয়, পাল্টাতে হয়।

ম। কিন্তু খদ্দের ত বলে দিয়েছে যে, দোকানপাট তুলে দাও। এই কেনাবেচার হাটে তোমাকে আমি আর বসিয়ে রাখতে চাই না।

শি। সেখানেই ত আমার আপত্তি। তুমি কে আমার যে, তোমার ইচ্ছামত আর তোমার উপর নির্ভর করে সারা জীবন কাটাবার জন্য আমি দোকানপাট তুলে দেব? অথচ তুমি আমার কে নও যে—আমার দোকানদারী তোমাকে বদনাম দেয়, তবুও সেটাকে চালিয়ে যাব?

ম। তবে?

শি। তবে আমার একমাত্র পথ হচ্ছে, এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া।

ম। তবে যে আমাকেও ছেড়ে যাবে তুমি।

শি। না, তোমাকে ছেড়ে যাবনা বলেই তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। অথচ তোমায় ছেড়ে না গেলে তোমায় পাওয়াও হবে না।

ম। বুঝতে পারছি না শিরি, কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

শি। আমিই কি বুঝতে পারছি ছাই? তবে এটা ঠিক যে তোমার জন্যই তোমায় ছেড়ে যেতে হবে।

ম। তুমি বাংলা নভেলের মত কথা বলছ, শিরি। আমি ওসব কিছু বুঝি না। মোটা কথায় বল, তাহলে যদি বুঝতে পারি।

শি। শোন, তুমিও খুব ভাল বাংলা জান, আর আমিও লক্ষৌ-ওয়ালীর মেয়ে হলেও বাংলা ভাল করেই শিখেছি। সোজা সাদা বাংলা কথায়—তোমার ছাড়তে হবে হয় তোমার সমাজকে, না হয় আমাকে। আর আমার ছাড়তে হবে হয় তোমাকে, না হয় তুমি যে দেশে আছ সে-দেশকে। কিন্তু আমাদের জাত-ব্যবসাতে এসব ছাড়াছাড়ির কারবার নেই। একজনকে ছেড়ে আর একজনকে ধরাই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু আমি এখানেই সব শেষ করে দিলাম। শিরিন বেগমকে আর কেউ বাইজী-জগতে পাবে না। তুমি আমায় বিদায় দাও, আর আমার বাড়ী দুটো নিয়ে আমায় হালকা করে দাও।

—বলতে বলতে তার চোখদুটি ছলছল করে উঠল। সুর্মার মায়া নয়, বিষাদের ছায়া চোখদুটিকে ঢেকে রেখেছে। মোহ নয়, মমতায় সকরুণ দুটি চোখ।

শুনতে শুনতে মনোহরের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল। দীনতা নয়, দৃঢ়তায় ভরা দুটি চোখ।

মনোহর বলে উঠলেন, 'সংসারে শুধু এইটুকু হতেই আমার বাকী আছে। কত কারবারীকে হারিয়ে কত কলকৌশল করে টাকা করেছি, সম্পত্তি করেছি। এবার শুধু তোমার সম্পত্তি দখল করে বড়লোক হওয়াটাই বাকী আছে। সমাজ ত আমাকে ছেড়েছেই, আমিও সমাজ ছেড়ে দেব। কিন্তু সেটা তোমাকে রাখার জন্য, তোমার সম্পত্তি পাওয়ার ফলে নয়।

শি। কেন, আমার সম্পত্তির মধ্যেও কি বাইজীর গন্ধ আছে? না, আমার জাতের ছাপমোহর আছে আমার টাকার উপর?

ম। না, না, সে কথা নয়। সমাজে বলবে, তোমাকে ঠকিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েলোকের টাকা হাত করেছি। আর তুমি চলে গেছ, মানে তোমায় ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তোমার টাকা বেহাত করে নিয়েছি—এ কথায় আমার মাথা রোজ কাটা যাবে সমাজে।

শি। কিন্তু লোকে জানবে কি করে?

ম। জানবে, ঠিক জানবে। আর আমার মন ত জানবে।

শি। কিন্তু—

ম। কিন্তু টাকার কথাটা বড় নয়, তোমায় ছেড়ে দিতে পারব না আমি। তুমি আমার কাছে থাক।

শিরিন এবার দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, 'আমি তোমার সম্পত্তি নই, বিয়ে-করা বৌও নই। আমার মনে চাইছে আমি এ পথ ছেড়ে দেব, বিদেশে চলে যাব। তোমার বাধা দেবার কি অধিকার আছে?

একটুক্ষণ নীরব থেকে মনোহর উত্তর দিলেন, 'অধিকারের আমার কিছুই নেই। টাকায় আবার অধিকার হয় কবে? তবে মনের ত কিছু অধিকার হয়। তুমি বিলেত চলে যেতে চাইছ, আমার মনের অধিকার তোমার উপর এসে পড়েছে বলে। তাই নয় কি? তা না হলে যেতে চাইছ কেন?'

পুঁথি দেয় বিদ্যা, কিন্তু মাথা দেয় বুদ্ধি। তর্কে হেরে বিদুষী শিরিন অন্য পথ নিল।

বললে, 'সে যাই হোক, তোমায় তোমার সমাজ ছেড়ে যেতে দেব না। আমি একটা বাইজী—তার জন্য তোমার সংসার, সমাজ, পরিবার সব ভেসে যেতে দেব না কিছুতেই।'

মনোহরের মন এরও উত্তর তৈরী করেই রেখেছিল। তিনি বললেন, 'তুমি যদি আমার কাছে শুধু একজন বাইজী হতে, তাহলে ঘুরে ঘুরে অন্য কত বাইজীর কাছেই ত যেতাম। তাতে ত সমাজ দোষ

দেয় না, পরিবারও আপত্তি করে না। কিন্তু তুমি যে 'তুমি', তাতেই যত মুশকিল।'

শি। আসান ত হাতে তুলেই দিচ্ছি।

ম। না, তুমি যে তুমি, তাতেই কোন মুশকিল আমি দেখছি না। কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমার পরিবারের চেয়ে বেশী আপন, তোমাতে আমি বেশী আনন্দ পাই।

শিরিন বলে উঠল, 'ছি, এ কথা ব'লো না। বললে পাপ হয়। প্যারিসের লালবাতির পাড়ার রোশনাইয়ের চটকে ভুলে আমাদের গেরস্ত ঘরের সাঁঝের প্রদীপকে ছোট মনে করা পাপ। যে দীপ তোমার ঘরে আমি জ্বালাতে পেলাম না, সে দীপ আমার মনে চিরকাল জ্বলতে থাকুক। এই আমার জন্য প্রার্থনা ক'রো।'

মাথা নেড়ে সজোরে মনোহরবাবু বললেন, 'না, না, আমি ব্যবসা-দার লোক। আমি কথার কথা নিয়ে ভুলে থাকতে পারি না। আমি তোমার সঙ্গে নতুন সংসার পাতব। চলে যাব এ দেশ ছেড়ে। নতুন কারবার খুলব সিঙ্গাপুরে গিয়ে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে।'

শিরিন এ কথাতে একটুও ভুলল না। বলল, 'যেখানেই তুমি যাও, তোমার সংসার আছে, স্ত্রী পুত্র, সমাজ আছে। আমি ত তোমাকে সে সব ছেড়ে যেতে দিতে পারিনা। তুমি যদি যেতে চাও তা হলে একা যেয়ো। আমাকে সঙ্গে পাবে না।'

ম। না, না, তোমাকে যেতে হবে। তোমার জন্যই ত যাওয়া।

শি। না, আমার জন্যই থাকা। আমি চলে যাব তুমি থাকবে বলে।

ম। কিন্তু আমি কি করে থাকব? আমি আবার বলছি যে, তুমি আমার স্ত্রীর চেয়ে আপন। তোমাতেই আমি বেশী আনন্দ পেয়েছি।

এবার রাগ করল না শিরিন। সহানুভূতির সুরে মনোহরের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'ছি, একথা বলতে নেই। আমি দিই গোলাপী সরবৎ, তোমার স্ত্রী দেয় পিপাসার জল। সে কথা তুমি এখন বুঝবে না। কেবল তখনি বুঝবে, যখন সে থাকবে না। আনন্দ যে বেশী পাও তার কারণ আনন্দ দেওয়াই ত আমরা শিখেছি। সেটাই ত আমাদের ব্যবসা।'

প্রতিবাদ করে মনোহরবাবু বললেন, 'ব্যবসা-ব্যবসা ক'রো না, শিরিন। কোন্‌টা ব্যবসা আর কোন্‌টা আসল কাজ তা ব্যবসাদার আমি খুব ভাল চিনি।'

ঠাণ্ডা স্বরে গরম দুটি হাত দিয়ে মনোহরের ডান হাতটি চেপে ধরে শিরিন বলল, 'তবু বলছি, আমায় ছেড়ে দাও, আমার পথে বাধা হয়ো না। আমায় যেতে দাও। যেতে দাও!'

এর পর আর কোন কথা চলে না তর্ক যেখানে হার মানল, মিনতি সেখানে জিতে গেল।

(৫)

হঠাৎ শুনতে পেলাম মনোহরবাবু আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছেন, 'বাবুসাহেব, আপনি বোধ হয় ভাবছেন যে আমি বানিয়ে বলছি।'

বললাম, 'না, না, তা কেন ভাবব। এসব কথা সত্যি না হলে একজন অপরিচিত লোককে কেনই বা আপনি বলতে যাবেন?'

'তবে আপনি কেন বাইরে জানলার দিকে ওরকম করে তাকিয়ে ছিলেন? আপনার বোধ হয় ভাল লাগছে না এসব কথা।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তার কারণ কোন অবিশ্বাস বা এই ভদ্রলোকের কাহিনী শুনবার অনিচ্ছা নয়। এই

ব্যবসায়ী আর তার বসন্তসেনার কথা ভাবতে ভাবতে আমি একটু, যাকে বলে, দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম যে, প্রাচীন সংস্কৃতযুগে যখন রসিকা নাগরিকারা মন ভোলানোর অভিনয়ে নামত, তখনো কি তাদের এমন অবস্থার মধ্যে পড়ত হত? তারা কি পারত তাদের অতীত অভিনয়ের সাজ খসিয়ে ফেলে নিরাভরণা সীমন্তিনীর বেশে তুলসীতলায় শঙ্খ ও দীপ হাতে এসে দাঁড়াতে? তাদের জন্য কি থাকত সংসারের দরজা খোলা? থাকত গৃহলক্ষ্মীর সিন্দুরের টিপ সাজান?

মুখে একটু সলজ্জ হাসি ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'শেঠজী, আপনার গল্প আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু ভাল লাগেনি তার পরিণামটা। আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'না বাবুসাহেব, আমার কষ্টের কথা থাকুক। কিন্তু আপনি দেখুন, আমার শিরিন কত কষ্ট পাবে! বিদেশে একা চলে গেল। আমার জন্যই ত চলে গেল। আমার দুঃখের মধ্যেও কত আনন্দ কিন্তু সে কথাটা।'

মনে মনে বললাম—মরুভূমিতে যে ফুল ফুটেছে, তারই প্রমাণ দেখছি।

মুখে বললাম, 'শেঠজী, সংসারে সেটাই বড় কথা। দুঃখের মধ্যে আপনি যদি আনন্দ দেখতে পান, তার চেয়ে বড় পাওয়া আর কেউ পেতে পারে না।'

'কিন্তু খানিকক্ষণ আগে পর্যন্তও তা পাইনি—' বললেন তিনি।

বললাম, 'মনে মনে সে আনন্দ নিশ্চয়ই হচ্ছিল। না হলে আপনি আমায় ডেকে আনতেন না এ কাহিনী শোনাবার জন্য। আনন্দ যখন কূল ছাপিয়ে যায় তখনি পারের লোকেরা পর হলেও তার ভাগ পায়।'

'কিন্তু হরপিয়ারী ? অর্থাৎ আমার স্ত্রী—?' এই অসমাপ্ত প্রশ্নটুকু করে মনোহরবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বললাম, 'আপনি যে আনন্দ পেয়েছেন তাতে আপনার স্ত্রীকেও আপনি সইতে পারবেন নিশ্চয়।'

মুখে বললাম এ কথা, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম—সহনীয়া বটে, কিন্তু মোহনীয়া নয়। সহেলীও নয়। শুধুই সহনীয়া।

কিন্তু আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাঁড় ব্যবসাদার, মনস্তত্ত্বের শিক্ষাহীন মুরলীমনোহর বলে উঠলেন, 'ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন আপনি। হরপিয়ারীকে আর আমার খারাপ লাগবে না। তা লাগলে তো শিরিনের বিলেতে চলে যাওয়াই ব্যর্থ হবে। এবার আমি ফিরে গিয়ে ওকে খুশী করবার চেষ্টা করব। পারব, নিশ্চয়ই পারব। বেচারিকে বড় অবহেলা করেছি এতদিন।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক।

গল্প-উপন্যাস-পড়া শিক্ষাভিমানী মন আমার স্তব্ধ হয়ে চুপ করে রইল। বুকের মধ্যে যেন শুনতে পাচ্ছি ঢুপ্-ঢুপ্-ঢুপ্ শব্দ করতে করতে বিরহের বেদনায় নীল সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে 'ওরিয়েণ্টালিয়া' জাহাজ দূরে, আরো দূরে এগিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠছে একটি ছবি। তার একটি নিরালা কেবিনে একা বসে শিরিন অপলক দৃষ্টিতে বাইরে সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে আছে। মুরলীমনোহরের তুলসীতলায় যে সন্ধ্যাদীপটি সে জ্বালাতে পারল না, ওটি কি সেই সন্ধ্যাদীপ ? তারি আলো কি এসে বসন্তসেনার চোখে তারার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে ?

আলো, আলো, জীবনের দীপশিখা দিয়ে আরো আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যাও !

বিদেশিনী

বিদেশিনী যে চিরকালই স্বপ্নের ধন, সে কথা কে না জানে ?

তবু জীবনে কখনও বিদেশিনীর আবির্ভাব হয় কিনা, আর হলে কি অবস্থা হতে পারে—সে কথা ঘরের কোণায় 'ফায়ার প্লেস'এর পাশে আগুনের গরম উপভোগ করতে করতে ভাবছিলাম।

বিদেশে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে রেখে একা-একা আর দিন কাটছে না। মা গো, মা—কেন বিদেশে পড়তে এসেছিলাম মরতে, তা জানি না। দেশে থেকে কি আর পড়াশোনা শেষ করা যায় না ? তার উপর এই স্পেনে। ছি, ছোকরারা যেন মুখে রস্থনের আরকের গন্ধ মেখে কলেজে পড়তে আসে আর পকেট ভর্তি করে নিয়ে আসে জলপাই। প্রফেসারের বক্তৃতা শুনি, না রস্থনের অত্যাচার এড়াই—এই চিন্তা করতে করতে পথ পাই না। ভাবি, ক্লাস পালিয়ে বাইরে গিয়ে পাইপ টানতে পারলেই ভাল হয়। এমন সময় প্রফেসারের কড়া নজর ফাঁকি দিয়ে টক্ করে পকেট থেকে কয়েকটা জলপাই বের করে ওরা একেবারে আমার হাতের মধ্যে চালান করে দেয়। কলকাতায় স্কুলে পড়তে এসব হাত-সাফাইয়ের বিদ্যা চালিয়েছিলাম বটে। তা বলে এই বয়সে এত পয়সা খরচ করে বিদেশে পড়তে এসেও এই সব ?

ছুটির দিনে সন্ধ্যাবেলা একা ঘরে বসে একথা ভাবতে ভাবতে, পাইপ টানতে টানতে দেশ থেকে সদ্য-পাওয়া মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছি। বিদেশে ছেলে গৃহকাতর হয়ে পড়বে বলে বাড়ী থেকে এই আদরের ব্যবস্থা। কিন্তু কি-ই বা লেখা থাকে এসব পত্রিকায় ?

গল্পর সংখ্যা একান্তই কম আর প্রবন্ধ পড়া আর প্রফেসারের নিত্য ক্লাসে ঝালাপালা বক্তৃতা সে ত একই রকমের জিনিস।

কিন্তু হঠাৎ একটা জায়গায় এসে চোখ ঠেকে গেল। নতুন কে এক লেখকের লেখা দেখছি। পড়তে খুব ভাল লাগল। নিজের মনেই বার বার করে পড়তে লাগলাম ঃ

"এই বিদেশিনীকে ঘিরে কত কল্পনা, কত কাব্যরচনা, কত হৃদয়োচ্ছ্বাস! যার সন্ধানে রূপকথার রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—সেই বিদেশিনী। বৃক্ষলতার অনন্ত আনন্দ-মর্মরে, শুভ্র অভ্রদলের লীলাকলায়, ঘন বন-শয়নের শ্যামলিমায় যার আভাস পাই সে-ই বিদেশিনী। সে কিন্তু চিরকাল সকল সন্ধানের অবসান ও প্রাপ্তির অতীত হয়েই রইল,—সে শুধু একটা আনন্দের কণিকা—যাকে অনুভব করা যাবে; স্পর্শ করা যাবে না, দেখা যাবে না। গোপন বলেই সে মধুর, নীরব বলেই তার জন্য কবির বাঁশী চিরন্তন মুখর, অপ্রকাশ বলেই তাকে প্রকাশ করবার এত ভুবন-ভরা আয়োজন। কিন্তু সে ত মানবের দেশের নয়, সে যে বিদেশিনী।"
[ইয়োরোপা]

বড় ভাল লাগল। মনে হল, এ কথা যে লিখেছে তার মনের সামনে সমস্ত পৃথিবীর দুয়ার খোলা রয়েছে। স্বদেশে বসেই সে বিদেশের স্বাদ উপভোগ করে মনে মনে।

তা করুক। আমার ঘরটা যেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আর একটা বড় কয়লার টুকরো ফেলে দিয়ে ড্রেসিং গাউনটা ভাল করে মুড়ে বসলাম।

হঠাৎ ঘরের দরজায় দুটো গরমাগরম টোকা পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে এসে ঢুকল আমার সিংহলী বন্ধু বননায়কে। মাথার চুল কোঁকড়া-

কোঁকড়া এবং ঝাঁকড়া। মনে মনে ভাবি যে সারা জীবন নারকেল তেল ঢালার ফলেই মাথার ওই চুল এত গজিয়েছে। কিন্তু সেই চুলের রাশি তার শ্যামবর্ণ মুখটির জন্য যেন প্রাণঢালা পটভূমিকা তৈরী করে রেখেছে। চোখে খেলে তার ট্রপিক্যাল গরম দেশের বিদ্যুৎ, বাহুতে তার বনস্পতির বল, কণ্ঠে বাজে পাতার মর্মরধ্বনি। নিজের দেশে একটা বড় নারকেল বাগানের মালিক সে। সেই বাগানেই সে জন্মেছে। সেখানেই, সাগরতীরের দক্ষিণ হাওয়ার সঙ্গে নারকেল গাছের দোলা খাওয়ার মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে। প্রাণশক্তি তাই তার অঢেল। এবং আকর্ষণী শক্তিও।

কৌতূহলও তার তেমনি দমানো যায় না। সচিত্র পত্রিকাখানা সামনে খোলা রয়েছে দেখে সে বলল, 'নুয়োভো, এটা কি বই ?'

পাছে আমার গৃহকাতরতাকে সে কোন ঠাট্টা করে, তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কিছু নয় ; কিছু নয় ; আমাদের দেশের এক নূতন সাহিত্যিকের লেখা পড়ছিলাম।'

কৌতুকে ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'নুয়োভো, তোমার নাম 'নতুন', তাই বুঝি তুমি নতুন কিছু ছাড়া কোন কিছুই পছন্দ কর না? তাই বুঝি নতুন সাহিত্যিকের লেখা পড়ছ ?'

বাবা-মা নাম রেখেছিলেন নবদ্বীপ। নামটার উপর আমার ছেলেবেলা থেকেই বিতৃষ্ণা। পাড়ার ছেলেরা খেপাত। বলত, 'গোঁসাইজী, কলকাতা তোমার যোগ্য জায়গা নয়, চোর-বাটপাড়ও জুটেছে অনেক। শহর ছাড় এবার।' স্কুলে পড়া না পারলেই সংস্কৃতের সেকেণ্ড পণ্ডিত মুখ খিঁচিয়ে বলতেন, 'এবার কোঁটাচন্দন কাটতে শুরু করো, অং-বং আপনি বেরোতে আরম্ভ করবে, বাবাজীবন।' আর কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে নতুন ইয়ার-বন্ধুরা যা

বলত, তা আর নাই বললাম। বোষ্টমী কথাটার উপরই আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে।

যাই হোক, স্পেনে যে ওরা 'নব'কে মুয়োভো বলে ডাকছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। নতুন, হ্যাঁ, নতুন-ই হয়েছে আমার সাবেকী নামটা।

আমি বললাম, 'সেজন্যই আমি তোমার নতুন য়্যাডভেঞ্চারের কাহিনী জানতে চাই।'

তার নিজের কথা জিজ্ঞেস করাতে সে চুপ করে গেল হঠাৎ। যেন সাগরে স্নানের পর দক্ষিণে বাতাস হঠাৎ তার বনরাজিনীলা নারকেল বনের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল।

সে যদি নিজে থেকে চুপ করে যায়, তাকে কথা কওয়াতে পারব এমন শক্তি আমার নেই। বুঝলাম কোন নিবিড়ভাবে নিজস্ব কাহিনীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি আমি, কিন্তু ধাক্কাধাক্কি করলে সে দোর খুলবে না। তার চেয়ে অন্য কথায় যাওয়া যাক।

বললাম, 'শোনো, আমার এই নতুন পত্রিকাটিতে নতুন ধরনের একটি লেখা বেরিয়েছে। ইয়োরোপের কাহিনীকে কাব্যের ভাবে ও ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। শোনো।'

মুখে মুখে স্প্যানিশ ও যেখানে স্প্যানিশে ঠিক কুলাচ্ছিল না সেখানে ইংরেজীতে অনুবাদ করে যেতে লাগলাম।

বিদেশিনীর বর্ণনা যখন শেষ হল সে চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, 'থামো মুয়োভো, থামো। তোমার নতুন লেখক কিচ্ছু জানে না। বিদেশিনীর সে কি বোঝে?'

আমি বললাম, 'কেন? কথাটা ত ঠিকই বলেছে। বিদেশিনীকে কি কেউ পেয়েছে কখনো?'

বননায়কে বলে উঠল, 'কেন পাবে না? সকলেই পেতে পারে যদি চায়। সকলেই মনে মনে খুঁজে বেড়ায়, সে কথা ঠিক। কিন্তু

মুশকিল হচ্ছে, যত দিন যত সাধনা দিয়ে সন্ধান করা দরকার তা করে না। সেজন্যই শুধু হাতে শূন্য ঘরে ফিরে আসে।'

তার পিঠে হাত রেখে যেন কত সান্ত্বনা দিচ্ছি এমন ভাবে বললাম, 'ভাই বুয়েনস, তোমায় যেন শূন্য হাতে সোনার লঙ্কায় ফিরে যেতে না হয়, সে প্রার্থনা করি।'

অধীরভাবে বলে উঠল সে, 'তোমরা বাঙালীরা খুব ভাবপ্রবণ, তাই খুব বড় বড় কথা বলতে ওস্তাদ। জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল কি কখনো তোমার ওই লেখক, যে সে বিদেশিনীর 'ডেফিনিশন' দিতে বসেছে?'

হালকা ঠাট্টায় আবহাওয়াটাকে সহজ করে তুলবার চেষ্টায় বললাম, 'না ভাই, ওটা ঠিক 'ডেফিনিশন' নয়। আর জানই ত, নুনের পুতুল লবণ-সমুদ্রে যদি ডুব দেয়, তাহলে ফিরে এসে আর নুনের হিসাব দেবার অবস্থা তার থাকবে না। ওই লেখকটি মনে হচ্ছে বিদেশিনী-সাগরে ডুব দিয়ে রত্ন সন্ধান করতে পারেনি। কিন্তু তুমি ত পাকা ডুবুরী। তোমার কথাই আলাদা।'

একটু কড়া ভাবে সে বলল, 'কেন? আমায় কি পেয়েছ তুমি?'

হাসিমুখে বললাম, 'কিছুই না। কিন্তু তুমি যে বেশ কিছু পেয়েছ, তা বুঝতে পারছি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। আমার ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। শুধু চুল্লীর মধ্যে থেকে এক একটা অগ্নিশিখা হঠাৎ লম্বা লম্বা হাত তুলে আমাদের নীরবতাকে নমস্কার করে আবার মিলিয়ে যেতে লাগল। ঘরটা অল্প একটু গরম হয়ে উঠল, আর নীল ও সোনালী রেশমের কাজ করা পাতলা চাদরে ঢাকা টেবিলের উপর রাখা লাইলাক্ ফুলের গোছার মধ্যে থেকে একটা অত্যন্ত মৃদু সৌরভ বের হয়ে ঘরটা ছেয়ে ফেলল।

মাঝে মাঝে বননায়কের দিকে তাকাচ্ছি। সামনে খোলা পত্রিকাটার পাতা নিশ্চিন্তভাবে যেন পড়ে আছে। তার চোখের দিকে নজর করে দেখছি, সে-ও সেই পাতাটার দিকেই তাকিয়ে আছে—যেখানে বিদেশিনীর বর্ণনা আছে। যে জায়গাটা অনুবাদ করে তাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম।

একটু পরে সে উঠে দাঁড়াল। আগুনটার কাছে গিয়ে হাত দুটো একটু গরম করে নিল। অন্যমনে একটা লাইলাক্ ফুল তুলে নিলে ফুলদানি থেকে। আবার কি না-জানি ভেবে কয়লার টবটার মধ্যে ফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বুঝলাম ওর মনে উঠেছে ঝড়। কিন্তু তা ঝেড়ে প্রকাশ করে না ফেলা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।

পদ্মের পাতার ওপর যেন এক বিন্দু জল চিকচিক করছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, আমার বলিষ্ঠ যুবক-বন্ধু বননায়কের টানা-টানা চোখে এক ফোঁটা জল। আলগোছে আমার রুমালটা ওর ডান হাতে গুঁজে দিলাম।

এই সামান্য সহানুভূতিটুকুর পরশে আকাশ ভেঙে যেন জল ঝরতে আরম্ভ করল। সে আমার টেবিলে ওই ফুলদানিটার পাশে হাতে মুখ ঢেকে চোখের জলে রেশমী ঢাকনাটা ভিজিয়ে দিতে লাগল।

চোখের জলে ভেজা কণ্ঠস্বরে সে বলল, 'মুয়োভো, আজ আমি দেশ থেকে চিঠি পেয়েছি—'

দেশ থেকে চিঠি ত প্রত্যেক শনিবারেই আসে, আর তার মধ্যে নূতনত্বেরই বা কি আছে? কিন্তু বুঝলাম যে, সে কিছু বলতে চায়।

বললাম, 'বল না আমায়, যদি অবশ্য তোমার কোন বাধা না থাকে।'

মুখ তুলে চোখের জলে সে বলল, 'না, বাধা কিছু নেই। তবে

আজ থাক। কাল তুমি রাত বারটার সময় 'পুয়ের্তা দেল সল'-এ এসো—নববর্ষ আবাহনের জন্য। সেখানে সব বুঝতে পারবে।'

(২)

৩১শে ডিসেম্বর রাত বারটার সময় যে 'পুয়ের্তা দেল সল'-এ আসেনি, সে স্পেনকে দেখেনি। মথুরার পথে পথে দোলের দিন বেলা বারটায় যে হল্লা ও হুল্লোড় দেখা যায়, তারই সাহেবী সংস্করণ পাই মাদ্রিদে সূর্যতোরণে। হিস্পানীর দল রাজপথে দল পাকিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। নাচছে খাস দখল সাব্যস্ত করে। লোকের হট্টগোল আর অটোম্যাটিক সিগন্যালের ঘণ্টাধ্বনি ছাপিয়ে গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং করে পুরোনো বছরকে বিদায় দেবার জন্য। এক-একটি করে ঘণ্টা পড়ছে আর লোকে এক-একটি করে আঙুর মুখে ফেলছে। নাচতে নাচতে সবাই ঘুরে ঘুরে সরে যাচ্ছে। লোকের ভিড়ে পরিচিত কোন লোককে এর মধ্যে খুঁজে বের করা অসম্ভব।

প্রায় হতাশ হয়ে ভাবছি ফিরে আসব। কোথায় গেল বননায়কে, আর কোথায় তার ব্যক্তিগত জীবনের রহস্য খুলে দেখান। আর সে কাজের জন্য এই হট্টগোলের বাজারকেই যে সে কেন উপযুক্ত জায়গা মনে করল, তা সে-ই জানে।

এই হৈহয় সংঘে যোগ দিয়ে জনস্রোতে ভেসে ভেসে নিরুদ্দেশ যাত্রার পথিক হয়ে চলে যাবার লোভ খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। তবু ভাবলাম তার চেয়ে বাড়ী চলে যাই। এই ঠাণ্ডার মধ্যে ওভার-কোটের ভার বয়ে বেড়ানর চেয়ে পাখীর পালকের লেপের ভার বয়ে নিদ্রা দেবীর আরাধনা অনেক ভাল।

এই ভেবে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলপথে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামছি, এমন সময় দেখি দূরে বন্ধু আমার একটি হিস্পানী তরুণীর

সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু এইরকম একটা মানসিক চাঞ্চল্যের মুহূর্তেও সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। যেন কাউকে খুঁজছে। তাকাতে তাকাতে সে আমায় দেখতে পেয়েই এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যে, বুঝতে পারলাম আমায় দেখতে পেয়ে এবং সম্ভবতঃ আমিও তার সঙ্গিনীকে দেখতে পাওয়াতে সে অত্যন্ত খুশী হয়েছে।

দুজনে একটা কাফেতে গিয়ে বসলাম। আজকের রাতে 'কাফে' ত শুধু পানভোজনের জায়গা নয়। এখানে চলছে নাচের পাগলা ফোয়ারা, কিশোর যুবা বৃদ্ধা সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি বছর থেকে আর একটি বছরে—নিরাশা ও বেদনার স্মৃতি পার হয়ে আশা ও আনন্দের পারে। বাজনার তালে তালে অতীত লোপ পাচ্ছে, আর ঘোমটা খুলে পড়ছে নতুন বর্ষের। নিত্য নূতন এগিয়ে আসছে নাচতে নাচতে, কন্‌ফেট্টি জড়ানো চরণে।

বননায়কেও এগিয়ে এল আমার খুব কাছে। আমাদের দু'জনের মাঝখানে ছোট্ট টেবিলটা উপেক্ষা করেই সে আমার দিকে ঝুঁকে বসল। 'মাদিয়েরা'র ছোট গ্লাসটা তার মুখে তোলাই রয়েছে; কিন্তু বুঝতে পারছি যে, সে মুখ বুকের কথা খুলে বলবার জন্য ব্যাকুল।

বললাম, 'বন্ধু, ওই মেয়েটি তোমাকে 'বুয়েনস' বলে ডাকল মনে হল।'

ক্ষীণ হেসে সে বলল, 'সে কথা ঠিক। সে আমাকে বুয়েনস বলেই ডাকে। কিন্তু জানে না কত অসৎ আমার মতলব এখন।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, তা কেন হবে? তুমি সত্যই বুয়েনস (ভাল)। মন্দ ত কোন দিনই ছিলে না।'

মাদিয়েরার গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সে বলল, 'আহা, বেচারা নীড় রচনার স্বপ্ন দেখছে।'

আ। তুমি নিশ্চয়ই তাকে সে স্বপ্ন দেখবার কারণ দিয়েছ।

ব। ঠিক তা দিইনি। কিন্তু জান মেয়েরা ও-স্বপ্ন দেখবার জন্য সর্বদাই পা বাড়িয়ে থাকে।

আ। আর ছেলেরা প্রস্তুত থাকে ওই স্বপ্নের লোভ দেখাবার জন্য।

ব। তা বলতে পার। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি কখনো সে লোভ দেখাইনি। নিজেই সে লোভ অনুভব করেছি কিন্তু অনুভব করাইনি।

এই নাচগানের হৈ-হৈ আবহাওয়ায় এরকম ব্যক্তিগত গভীর আলোচনা চলতে পারে না। তাকে ইশারা করে উঠে গেলাম বাইরে। দুরন্ত শীতের রাত্রি। হাঁটতে হাঁটতে শরীর গরম রেখে কথা কওয়া যাবে। তাই করতে লাগলাম।

আ। আমি ত ভাবতাম, তুমি খেলোয়াড় লোক; হৃদয়ের খেলায় যদি নাব, শুধু খেলার জন্যই খেলে যাবে, হারজিতের দিকে তাকাবে না। সেজন্য তোমায় কোন দিন জিজ্ঞেসও করিনি কিছু।

ব। জিজ্ঞেস করবারও ছিল না কিছু এতদিন। খেলার ছলে ঠিক নয়, খেলা ভুলবার জন্যই খেলে এসেছি এ-পর্যন্ত এ দেশে।

আ। তোমার কথা বড় হেঁয়ালির মত ঠেকছে। ঠিক বুঝতে পারছি না।

ব। তার কারণ, তুমি সংসারকে দেখছ শুধু বইয়ের ভেতর দিয়ে। জীবনের আঙিনায় তুমি কখনো পা দাওনি।

আ। আর তুমি জীবনের আঙিনায় শুধু ক্ষণ-সঙ্গিনীদের আনাগোনা দেখে যাচ্ছ।

ব। না, তা নয় সুয়োভো, একই জীবনে আমি দেখি নিত্য নতুনের আবির্ভাব, শুনি চিরন্তনীর চরণধ্বনি। আমাদের দেশের এক

বিখ্যাত জ্যোতিষী বলেছিলেন,—লগ্নে আমার আছে শনি, আর সেখানে দৃষ্টি পড়েছে বুধের। তার ফলে আমি তাকিয়ে থাকি ছেলেবেলা থেকেই পশ্চিমের দিকে, আর চাই নিত্য নবীনের সঙ্গে পরিচয়। মন বসে না কিছুতেই। রিনাকেও তাই ভালবাসতে পারলাম না বেশী দিন।

আ। তিনি কি তোমার স্বদেশীয়া?

ব। হ্যাঁ, রিনা এদিরিবীরা। আমারি দেশের লোক। আমারি মত নারকেল বাগানে সাগর সঙ্গীতের তালে তালে দুলে দুলে মানুষ হয়েছিল। তার শ্যাম সৌন্দর্যের মধ্যে পেয়েছিলাম শ্যামলা ধরণীর মায়া, ঘনকৃষ্ণ আঁখির মধ্যে গহীন অন্তরের আহ্বান। তবু, তবু মন টানল বিদেশে। তাই এখানে পড়তে এসেই তার কথা ভুলে গেলাম। ভাবলাম, নতুনের মধ্যে হবে যৌবনের অভিষেক।

আ। বোধ হয় তাকে তুমি ঠিক ভালবাসনি। কৈশোরের কল্পনায় যাকে ভালবাসা মনে করেছিলে, তা ছিল শুধু ইংরেজীতে যাকে বলে 'কাফ্-লভ্' অর্থাৎ বৎস-প্রিয়তা। অবশ্য ঠিক বাৎসল্য নয়।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা মাদ্রিদের চৌরঙ্গী 'পাসিয়ো দেল প্রাদো' রাস্তার পাশে সুন্দর বাগানে এসে পৌঁছেছি ততক্ষণে। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে। ওভারকোটের কলার তুলে গলাটা ভাল করে ঢেকে কান খাড়া করে বননায়কের প্রায়-মনে-মনে-বলা স্বীকারের কথা শুনে যেতে লাগলাম।

বন্ধু যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে বলে যেতে লাগল। কুয়াসায় ফুলে ফুলে ছাওয়া বাগানটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তার পটভূমিকায় তন্বী শ্যামা একটি সিংহল তরুণীকে খুব কাছে অনুভব করতে লাগলাম। একটা কেমন যেন মায়া পড়ে গেল তার উপর।

বননায়কে বলে যেতে লাগল, 'না, বৎসপ্রিয়তা নয়। চোখ-খোলা মানুষের মতই তাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু আমি কাউকে বেশী দিন ভালবাসতে পারি না। কেন জানি না। আমি যে লোক খারাপ, সে কথা আমার শত্রুরাও বলবে না। কিন্তু চির-চঞ্চল হয়ে আমি অতৃপ্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

আ। কিন্তু আজ যেন তুমি অন্যদিনের চেয়ে আরো বেশী চঞ্চল হয়ে রয়েছ।

ব। হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। রিনার চিঠি পেলাম আজ। সেই স্বপ্ন-দেখা স্বপ্নে-দেখা শ্যামলা কিশোরী নয়, এ যেন স্বপ্ন থেকে উঠে আসা পূর্ণ-জাগা লক্ষ্মী। সে সবল সাহসে লিখেছে যে, যে অদেখা অজানার পেছনে আমি মরীচিকার মত ছুটে চলেছি, সে সেই চিরনারী। আমার চোখ যদি কখনো খোলে তখনি দেখতে পাব যে, আমার পৃথিবী জুড়ে রয়েছে তারি অদেহী সত্তা।

দরদ-ভরা গলায় তাকে খুব ধীরে ধীরে শুধোলাম, 'তোমার চোখ কি বলে?'

নিস্পৃহভাবে সে বলল, 'চোখ আমার চেয়ে আছে অসীমের সন্ধানে। কে জানে কখন পরশমণির ছোঁয়া পাব, তবু বুঝতে পারব না। চলে চলে এগিয়ে যাওয়াই আমার সার হবে।'

বললাম, 'তা কখনই হবে না। তোমার মন নিশ্চয়ই চরম ক্ষণে পরম ধনকে চিনে নেবে।'

সে বলল, 'তা জানি না। তবে আজ আমি একটা নতুন আলোকে নতুন চেনার চেষ্টা করছি।'

বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে আমার একটা হাত তার দুটো হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরে বলল, 'জান, আজ সন্ধ্যায় আমি—আমি ম্যাডোরিনাকে রিনার কথা সব খুলে বলেছি।'

(৩)

আমি শ্রীনবদ্বীপ মহান্তি আজ একটু বিশেষ যত্ন করে পোশাক পরেছি। পকেট চিরকালই গড়ের মাঠ। যদি বা দু-এক বেলা সস্তায় পেট ভরানর ফলে দু-একটা সবুজ ঘাস সেখানে গজিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের মত কোন একটা খরচ হাজির হয় ও পকেটের শূন্য মাঠকে আবার লেপে-মুছে রেখে যায়। আজ তেমনি একটি অবস্থা হয়েছে আমার। মাদ্রিদ ইউনিভার্সিটির প্রাচ্য ইতিহাসের ছাত্র মুয়োভো মন্টি আজ একটা দামী আরবী সেণ্টের শিশি কিনেছে।

ফলে, এর পর দুদিন লাঞ্চ অর্থাৎ দুপুরের খাওয়া বাদ দিতে হবে। কিন্তু উপায় কি? বন্ধু বুয়েনস পরম শত্রুতার কাজ করে নেমন্তন্ন করে বসেছে। আমাকে ম্যারাথন নাচ দেখতে হবে তার বান্ধবী ম্যাডো-রিনার সঙ্গে।

আমার কোন আপত্তিই খাটল না।

প্রথমে বললাম, 'শাস্ত্রে বলেছে—পথি নারী বিবর্জিতা।'

সে হেসে বলল, 'তোমাকে ত কেউ তার সঙ্গে রাস্তায় হেঁটে যেতে বলছে না যে, বিদেশিনীর সঙ্গে ভারতীয়কে দেখে কেউ মন্দ ভাববে বা হিংসা করবে।'

বিব্রত হয়ে বললাম, 'না, না, তা নয়। মানে হচ্ছে যে, এই বয়সে একজন তরুণীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে নাচ দেখলে হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা আছে।'

ফস্‌ করে সে উত্তর দিল, 'হৃদয় যার আছে, তারই হৃদ্‌রোগের ভয় আছে। কাজেই তোমার সে ভয় নেই। আর যদিই বা থাকে, দেশী দাওয়াই দেবার জন্য তোমার বাপ মা নিশ্চয়ই দেশে তৈরি হচ্ছেন। অতএব মা ভৈঃ।'

তাতেও হাল ছাড়লাম না। বললাম, 'ম্যারাথন নাচ ত এক হাজার ঘণ্টা ধরে হবে। আমার মন যদি এক হাজার পার হয়ে এক হাজার এক রাত্রির আরব্য-উপন্যাসের রাজ্যে গিয়ে হাজির হয়, তাহলে 'অভাগা' দেশের হইবে কি ?'

'দেশ ?' সে হেসে বলল, 'দেশ ? তোমার মত ভাগ্যবান রত্নকে জন্ম দিয়েছে বলে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে একটি সিনরিটাকে ঘরে তুলে নেবে।'

মোট কথা, কোন অজুহাতেই এড়াতে পারলাম না। সে বলল যে আমার জন্য, এবং তার বান্ধবীর, তার বাবা মা ও ভাইয়ের সবার জন্যই সে আগে থেকে টিকিট কিনে রেখেছে।

অত্যন্ত, যাকে বলে, নার্ভাস হয়ে কি করে নিজেকে নারী-সঙ্গের উপযুক্ত করে তুলব, তার কূল-কিনারা না পেয়ে একটা সেন্টের শিশি কিনে ফেললাম। আশা করতে লাগলাম যে, কড়া আরবী সেন্টের সুগন্ধ মনকে ভরসা দিয়ে চাঙ্গা করে তুলবে।

আমার বাড়ীওয়ালীর স্বামী রিকার্দো অত্যন্ত রসিক ও সমঝদার বলে তার বন্ধুমহলে নাম আছে। সে কথা খাবার পরিবেশন করবার সময় প্রায়ই গৃহকর্ত্রী বলে থাকে। বন্ধ-করা দরজার ভিতর থেকেই বুঝতে পারছি যে, সে আমার সেন্টের গন্ধ টের পেয়েছে। কারণ গুনগুন করে গাইতে গাইতে কয়েকবার সে আমার ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করে গেছে। গানটিও অত্যন্ত অর্থসূচক— 'হে বাদামী রঙের বন্ধু আমার'।

শুনে মনে মনে হেসেছি এবং রাগও করেছি। ধ্যেৎ, ভারী অসভ্য। একটা দিন একজন বন্ধুর পার্টিতে যাচ্ছি। না হয় একটু সেন্টই মেখেছি। তা তো তোমাদের গায়ের বোটকা গন্ধের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বলেও মনে করতে পার। তবে কেন এত গানের কারবার ?

কিন্তু তার চেয়েও বেশী রাগ হল যখন আমি ঘর থেকে বার হয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাব, এমন সময় সে পেছন থেকে ডাকল, 'মন্টি মন্টি, তোমার জন্য একটি কার্নেশন ফুল রেখেছি ; এটা 'বাট্‌ন্‌ হোলে' (কোটের কোণার গর্তে) লাগিয়ে নিয়ে যাও। জয় তোমার নিশ্চয়ই হবে।'

রাগ দেখিয়ে বললাম, 'ধন্যবাদ। জয়ের কোন কথা উঠছে না এর মধ্যে কিন্তু—'

হেসে সে বলল, 'মন্টি এতদিনে হেরে যেতে চলেছে। সেই জন্য।'

আর কিছু না বলেই সে 'আদিয়স (বিদায়), মন্টি, আদিয়স' বলে হাত উড়িয়ে চলে গেল।

কানে আমার ধ্বনিত হতে লাগল—আদিয়স, আদিয়স। কানের ডগায় হয়ত রংও একটু বদলে গিয়েছিল।

মাটির নীচে রেল-টিউবে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম বন্ধুর কথা। সে কি আজ দোটানায় পড়ল ? কিন্তু তার দরকারই বা ছিল কি ? সুখী সে হয়ত কোনদিনই হবে না, কারণ চঞ্চলতা ও সংসারসুখ এক পথ দিয়ে হাঁটে না। ওর ভাল লাগা হচ্ছে আকাশের সাদা মেঘ। উড়ে যাওয়াতেই ওর সুখ, ভেসে যাওয়াতেই ওর শোভা। কোন পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিতে গেলেই গলে জল হয়ে শেষ হয়ে যাবে। তাই সে ক্ষণে ক্ষণে, সামনে বন্দর দেখলেই, বাঁধন ছিঁড়ে সরে পড়ে। রিনা ও ম্যাডোরিনা দুই-ই ওর চোখে এক। দুই-ই শুধু সাময়িকা, সমাপিকা নয় কেউ। ওদের দু'জনের মধ্যেই ও পাবে এক সন্ধ্যার ভোজ। চিরদিনের খোরাক নয়।

কিন্তু ভাবতে সময় পেলাম না। আমার বেঞ্চে পাশেই বসে এক বুড়ী যেন বড় বেশী তাকাতে আরম্ভ করেছে আড়চোখে, বুকের কোণায় গোঁজা ফুলটার দিকে। একটা বখা ছোকরা বোধ হয়

সুগন্ধটা বেশী করেই টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে উপভোগ করে নিচ্ছে। আজ আমার স্যুটটার কড়া নতুন ইস্ত্রিটা সকলেরই নজরে পড়ছে মনে হচ্ছে। নাঃ, লক্ষণ সুবিধের নয়। একটা কিছু গোলমাল ঘটবে বলেই মনে হচ্ছে।

সে গোলমাল আরো বেশী নিশ্চয় বলে মনে হতে লাগল, যখন নাচঘরে এলাম। সারি সারি গ্যালারি আর বক্স। দরজার সামনে অপেক্ষা করছি আমি এবং একটি হিস্পানী পরিবার। আর সবাই বেশ সোজা ভিতরে চলে যাচ্ছে। অতএব ধরে নিলাম যে, ওরাই হচ্ছে ম্যাডোরিনার বাবা মা, ভাই ও নিজে। ওরাও আমার দিকে তাকাচ্ছে দেখে বিব্রত হয়ে মুখটা অন্য দিকে সরিয়ে নিলাম।

কিন্তু ওই মেয়েটির দিকে আবার ফিরে তাকাতে লজ্জা হতে লাগল। একটি অপরিচিতা মেয়ের দিকে না তাকালে সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার হবে। এমন কি এই রসিক দেশের লোকেরা অবাক্ হয়ে যাবে এই সন্ন্যাসী-মার্কা মুখ দেখে। অতএব তাকানই নিরাপদ। তবু যে তরীর বাঁধন ছেঁড়বার উপক্রম হয়েছে, অনন্ত কালসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সে তরীর দিকে তাকাতে কারই বা ভাল লাগে?

এমন সময় দৌড়াতে দৌড়াতে এল বননায়কে। প্রচুর ক্ষমা-প্রার্থনা করতে করতে সে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

ম্যারাথন নাচ ম্যারাথন দৌড়ের মত। একটুও না থেমে যে যুগল একটানা এক হাজার ঘণ্টা নেচে যেতে পারবে, তারা খুব বড় একটা পুরস্কার পাবে এবং আর্থিক সুবিধার সঙ্গে নামডাকও যা পড়ে যাবে, তাতে জয়ী যুগলের আর অন্নবস্ত্রের ভাবনা কোনদিন ভাবতে হবে না। দেশের সেরা সেরা নাচিয়ে ছেলেমেয়েরা এসেছে নাচতে। তিন চার শ ঘণ্টার পর অনেকেই হার মেনে বিদায় নেয়। খাওয়াটাও চলে নাচের মধ্যেই। পা চালিয়ে যেতে হবে, না হলে বিদায় নিয়ে

চলে যেতে হবে—এই বন্দোবস্ত। মাঝে মাঝে মুখের চুনকাম সেরে নিচ্ছে। তা-ও ওই নাচেরই মধ্যে। আবার মাঝে মাঝে দেখন-সই বিশেষ নাচও দেখিয়ে দিচ্ছে। ঘুম যদি পেয়ে আসে, তাকে তাড়ান হবে ; দর্শকদেরও একঘেয়ে ভাব দূর হয়ে যাবে।

ডন ও ডোরির মাঝখানে বসে আমি ঘামতে লাগলাম ওই শীতের রাতে। হ্যাঁ, ভাইবোনের যে ডাকনাম ওই ছিল, তা বুঝতে দেরি হল না। ডোরির বাবা-মা আমায় বুয়েনসের বন্ধু বলে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, আমি খুব ভাল লোক। অর্থাৎ 'গুড ম্যান'। মনে মনে ভয় পেলাম যে, হয়ত তাঁদের মেয়ের শুভবিবাহে আমায় সবচেয়ে ভাল লোক অর্থাৎ 'বেস্ট ম্যান' বলে দেখবেন, এই আশা করছেন। তাই ডন ও ডোরির মাঝখানে বসে আমি ঘামতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে ডোরির মুখের দিকে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। সবাই ত নাচের মজলিসের দিকে তাকিয়ে আছে একমনে। কিন্তু আমি ত বুঝতে পারছি বুয়েনসের মনে কিরকম দোলা চলছে। আমি ত বুঝতে পারছি রিনা ও ম্যাডোরিনার টানা-হ্যাঁচড়ায় আমারও মন এই স্বপ্ন দেখতে উন্মুখ কিশোরীর মুখের দিকে বার বার তাকাতে চাচ্ছে। সামনে নাচের আঙিনায় একটি নিগ্রো সুন্দর দেহভঙ্গিমায় নানা রকম কৌশল দেখিয়ে নাচছে। বাজনার তালে তালে তার নাচের সঙ্গে মিল রেখে আর সব নাচিয়ে একসঙ্গে নেচে যাচ্ছে। প্রায় ছয় শ ঘণ্টার অবিরাম নাচের পরেও এতখানি উৎসাহ দর্শকদের সবাইকেই মাতিয়ে তুলেছে। শুধু আমিই নাচ দেখার চেয়ে দুটি মনের ঘাত প্রতিঘাতের দিকে বেশী লক্ষ্য রেখে চলেছি।

স্প্যানিশ ভদ্রলোকটি খানিক পরে বলে উঠলেন, 'উঃ, অসহ্য গরম।'

অবাক্ হয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, 'সে কি? এই জানুয়ারির রাতে—?' কিন্তু বলতে পারলাম না। হঠাৎ বুঝলাম যে, এর পেছনে একটা মতলব আছে। তাই বুকপকেট থেকে রেশমী রুমালটা বের করে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার অত্যাচার সহ্য করতে আরম্ভ করলাম।

ম্যাডোরিনার মা-ও বলে উঠলেন, 'সত্যিই বড় গরম। চলো বাইরে গিয়ে একটু হাওয়া খাওয়া যাক। ওরা মুচাচা-মুচাচো (বালক-বালিকা); ওদের ত গরম লাগে না।'

ভদ্রলোক স্ত্রীর গরম লাগার কষ্টের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে পড়লেন এবং আমাদের লক্ষ্য করে অন্যমনেই যেন বললেন, 'আর তোমাদের ত নাচগুলি খুব ভালই লাগছে; তোমরা বেশ অনেকক্ষণ দেখো। আমরা যদি গরমের জন্য না ফিরি, অপেক্ষা ক'রো না।'

ব্যাপারটা সবই বোঝা গেল। ভাবতে লাগলাম, এখন আমার হয়ত উচিত হবে ডনকে বলা যে, বড় ঠাণ্ডা লাগছে এখানে; চলো কোথাও গরম আগুনের কাছে গিয়ে বসা যাক।

বললামও ডনকে সে কথা। কিন্তু সে আমার ইঙ্গিতটা কানেও তুলল না। বলল, 'এখানে এত লোকের মাঝখানে এঁটে সেঁটে বসে গরমাগরম নাচ দেখছি,—এ ছেড়ে কোথায় যাব গরমের সন্ধানে?'

বললাম, 'ঠিক গরমের সন্ধানে নয়; একটু গরম কফি বা কিছু চকোলেট পাওয়া যেত।'

'কফি ত এখানেই আনালে চলে, আর ডোরি চকোলেটের বিশেষ ভক্ত নয়।' বললে সে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে, এ নেহাত অর্বাচীন অথবা অপদার্থ। যার না আছে বুদ্ধি, না আছে সহানুভূতি—তার দ্বারা সংসারে কোন কাজই হবে না। রামঃ কহ। এমন বোকা ছোকরার বোনের সঙ্গে প্রেমে পড়াও বিপদ।

বুয়েনস কিন্তু নাচের দিকে অত্যন্ত বেশী মন দিয়েছে—[illegible] ভাবে বেশী। ওর মুখ দেখে না বুঝতে পারছি এতগুলি টাকা খরচ করে পাঁচজন লোকের টিকিট কেনার ব্যথা, না সে খরচের পেছনে সার্থকতার কোন আভাস। ওর পোড়া মাটির মত রঙের মুখে কি কোন ভাবই খেলে না? তা ত নয়।

ডোরিও নাচের ঘুর-ঘুর গতির সঙ্গে বাজনা তাল রেখে চলছে কিনা তার দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছে। নাচ বাজনাকে চালাচ্ছে, না বাজনা নাচকে চালাচ্ছে—সে সম্বন্ধে বোধ হয় কাল কলেজে রচনা লিখতে হবে এমন একটি ভাব।

ডন ও ডোরির মধ্যে বসে সত্যিই আমি ঘামতে লাগলাম। নারকেল পাতার গানে মুখর গরম একটি দ্বীপের এক কুমারীর মূর্তি মনে মনে দেখতে দেখতে সত্যিই আমি ঘামতে লাগলাম। তার আকর্ষণের মাতাল-করা ভাব আজকের ম্যারাথন নাচের মধ্যে এসে পড়েছে। নারকেল কুঞ্জ-মর্মর অর্কেস্ট্রার মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর নারীর মধ্যে যে চিরবিদেশিনী লুকিয়ে থাকে, তার পরশ যেন চঞ্চল করে তুলেছে।

হঠাৎ সে চঞ্চলতার মোহ ভেঙে দিয়ে বুয়েনস বলে উঠল, 'মুয়োভো, সত্যিই তোমার ঠাণ্ডা লাগছে বুঝতে পারছি। তুমি আর ডন না হয় বাইরে গিয়ে একটু গরম হয়ে মাদিয়েরার অর্ডার দাও। আমরাও একটু পরেই যাচ্ছি।'

ডনকে হাত ধরে প্রায় টেনে উঠিয়ে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে চললাম 'বার'-এর সন্ধানে। যেন পিছনে তাড়া করেছে 'বুলফাইট'-এর লড়াই-পাগলা ষাঁড় মহারাজ।

(৪)

ম্যারাথন নাচটা বড় জমে উঠেছে। তার আকর্ষণ ঠেকাতে না পেরে নিজেও নেমে পড়েছি নাচতে। শ্রীনবদ্বীপ মহান্তি কোনদিন নাচতে জানত না, আর তার সান্ধ্য পোশাকই ছিলনা কোনদিন। সে কিনা আজ সিনর নুয়োভো মন্টি হয়ে বুকে সাদা কড়া ইস্ত্রির শার্ট ও গলায় সাদা প্রজাপতি ছাঁদের টাই চড়িয়ে, পিঠে ল্যাজ অর্থাৎ 'টেল কোট' ঝুলিয়ে এমন চমৎকার নাচছে যে—চারদিকে দর্শকরাই যে শুধু হাত তালি দিচ্ছে তা নয়, কয়েকজন নাচের প্রতিযোগী পর্যন্ত হাত তালি দিতে দিতে দিশেহারা হয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে হল নাচ থেকে বাতিল।

মনে ভারী দুঃখ হল। আমারি জন্য বেচারাদের এ দুর্গতি। আমি নতুন নাচতে নেমেই বিশ্বজনের মনোহরণ করতে শুরু করেছি। জীবনে প্রথম তৈরী-না-করে-বলা 'মেইডেন স্পীচ'-এর মত মেইডেন ড্যান্স অর্থাৎ কুমারী-নৃত্য করছি। আর আমারি নাচের তারিফ করতে গিয়ে কিনা কয়েকটি তরুণ তরুণী বাতিল হয়ে যাবে নাচ থেকে? ভাবলাম নাচতে নাচতে এগিয়ে গিয়ে ওদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে আসি, এমন সময় আমার বাহুতে বাঁধা 'ভিনাস দি মিলো' হঠাৎ আবার পাথর হয়ে গেলেন। রাগের চোটে কে এসে আমার কানের কাছে ধপাধপ আওয়াজ করতে আরম্ভ করল।

হঠাৎ চম্‌কে জেগে উঠে দেখি আমার দরজায় কে ধাক্কা মারছে জোরে। তর সইছে না। তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউনটা পরে বিজলী বাতি জ্বেলে জিজ্ঞেস করলাম 'কে?'

কড়া উত্তর এল, 'দরজা খুলুন, জলদি—আমি ডন।'

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দরজা খুলে দিলাম। 'বার' থেকে ফিরে আর বুয়েনস ও ডোরিকে তাদের সীটে পাইনি। কাজেই ওরা কোথাও

নিভৃত আলাপে ব্যস্ত আছে ভেবে দু'জনে মিলে নাচ দেখতে দেখতে মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম। কত রাত হয়েছিল তার ঠিক ছিল না, কারণ এ নাচ ত অহোরাত্র ব্যাপী যজ্ঞের কারবার। মোট কথা, অনেক রাত পর্যন্ত ছিলাম।

তারপর হল ঘুমের মধ্যে নাচ। কিন্তু এখন কি নাচছে ওটা ডনের হাতে? সর্বনাশ! হিস্পানীরা অবশ্য খুব ভালই ছোরা ছুঁড়তে জানে। ওটা ওদের একটা জাতীয় অনুষ্ঠানও বটে। তা বলে রাত দুটোর সময় এ কোন্ জাতের মস্করা, সিনর? আমি নিরীহ বৈষ্ণব সন্তান। কোন রকমে ভারতীয় ইতিহাসের স্প্যানিশ ও পোর্টুগীজ নথিপত্রগুলি পড়তে বিদেশে এসেছি বহু বাধা নিষেধের মধ্যে দিয়ে। ঠিক যেমন করে দেশে পানাপুকুরের পানাগুলি সযত্নে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে টুপ করে একটা ডুব দিয়ে স্নান সেরে নিতাম, তেমন করে। আর আমার উপর কিনা এ হেন অত্যাচার!

ব্যাপারটা একটু হাসি ঠাট্টায় হালকা করে তুলবার জন্য চেষ্টা করে হেসে বললাম, 'এ কি ডন? এই জানুয়ারির শেষ রাত্রে তুমি দেখছি অভিসারে বেরিয়েছ। কিন্তু ঠিকানাটা যেন ভুল করেছ মনে হচ্ছে।'

ঠাট্টাটা কানেও না তুলে সে বলল, 'ওসব ঠাট্টা চলবে না, সিনর মন্টি। তুমি আর তোমার বন্ধু, দু'জনকেই আমি দেখে নেব। কোথায় আছে ওই ষাঁড়টা, দেখাও আমাকে।'

হে বাবা বৃষরাজ, এ দেশে তুমি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বহু নরনারীর মনোহরণ করে থাক। কিন্তু এখন কেউ তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে যাচ্ছে না। দয়া করে আমাদের প্রাণ হরণের কারণ হয়ো না।

ভাবতে দিল না সে আমাকে একটুও। আবার তেড়ে প্রশ্ন করল, 'বলো, কোথায় আছে সেই বদমাশ শয়তানটা?'

মুখে সাহসের ভান করে বললাম, 'ও, তুমি বুয়েনসের কথা বলছ?

সে ত তুমি ভাল করেই জান, তাকে আর ডোরিকে আমরা নাচঘরে ফিরে এসে দেখতে পাইনি। কেন, ডোরি কি এখনো ফেরেনি নাকি?'

মুখ খিঁচিয়ে সে বলল, 'ফেরেনি নাকি? জিজ্ঞেস করো গিয়ে তোমার বন্ধুকে।'

বুঝলাম কোন ব্যাপার ঘটেছে। বোধ হয় ওরা দু'জনের কেউই এখনো ফেরেনি। উত্তর দিলাম, 'ওরা যদি এখনো ফেরেনি, তাহলে ধরে নাও ওদের আজই 'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট' হয়ে যাবে।'

এরকম একটা মনে ধরবার মত কারণ বের করতে পেরে খুব আনন্দ হল। ভাবলাম যে, হিস্পানী ছুরির ধার তাহলে আর এ হিঁদুর দেহের উপর পরীক্ষা করা হবে না। একটু নিশ্চিন্ত হতে যাচ্ছি, এমন সময় ডনের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার ঘাবড়ে গেলাম।

তার চোখে খেলা করছে ছুরির ধারালো আলো।

তরোয়াল যেরকম খাপের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে, ঠিক সেরকম ভাবে বেরিয়ে এল তার কথা, 'ষাঁড়! তুমি এন্‌গেজ্‌মেণ্টের স্বপ্ন দেখছ? ঠক, জোচ্চোর, তোমরা বিদেশী ষাঁড়ের দল, তোমাদের জন্যই আমাদের দেশে 'মাতাদোর' সৃষ্টি হয়েছিল। 'টরস'-এর (বুল ফাইটের) মেলায় ষাঁড়ের বদলে তোমাদের নামিয়ে দিতে হয়। নারী নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলা করতে চাও! এস, খেলো এবার আমার সঙ্গে 'টরস'।'

বলেই সে আমার বিছানার চাদরটা টেনে তুলে নিল। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না।

আমাকে আজ ও ষাঁড়ের খেলার ষাঁড় বানিয়েই ছাড়বে! ঘুরে ঘুরে চাদরটা গুটিয়ে ছড়িয়ে দেবে আমার গায়ে; আমায় যেতে হবে প্রাণপণে সে চাদর এড়িয়ে। জড়িয়ে পড়লেই সে ছুটে এসে একটা খোঁচায় প্রাণপাখীকে খাঁচা-ছাড়া করে ছাড়বে।

এবং তার আগে আত্মারাম ও দেহ-পাখী ঝটাপটি করে ঘুরে বেড়াবে টেবিল, চেয়ার, খাট—এ সবের এক পার থেকে আর-এক পার পর্যন্ত। কি করি? কোথায় যাই? কয়েকটা মোটা মোটা বই অবশ্য আছে টেবিলের উপর, কিন্তু তা ছুঁড়ে মেরে কি আর ওই বদ্ধপাগল, খুন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হিস্পানী ছোকরার হাতের ছুরি ফেলিয়ে দিতে পারব?

তার চেয়ে বেশী ভাবনা এই যে, যদি বা আমি আজ প্রাণে বেঁচে যাই, এই ফ্ল্যাটগুলির লোকরা কি ভাববে। রক্তাক্ত বা আহত অবস্থায় ওদের সামনে কাল মুখ দেখাব কি করে? আর দেশে যদি খবরটা কোন রকমে কোন সহৃদয় হিতৈষী বন্ধুর কল্যাণে উড়ে গিয়ে পৌঁছায়, তখন? তাহলে? ছি ছি, ভাবতেও লজ্জা করে।

কিন্তু ভাববার সময় দিলনা সে। আঠার বছর বয়সের কাঁচা বুদ্ধি ডন নিজের হাতে আজ আইন নিয়েছে। সমাজ-ব্যবস্থা আর ষাঁড়ের লড়াইয়ের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও সে নিজেই করে নেবে। বিকট এক ব্যঙ্গ করে সে বলল, 'কি হে সিনর মন্টি, ষাঁড় সাজতে মন চাচ্ছে না? না, ভাবছ যে ষাঁড়ের তুটো শিং থাকে, তোমাকেও তুটো শিং নিতে না দিলে তুমি ষাঁড় হবে কি করে? আচ্ছা, আমার হাতে আছে তলোয়ারের বদলে ছোরা; তুমি নিতে পার শিং-এর বদলে তু'কানের উপরে তুটো চিরুনি। আর তোমার কোটের ওই কার্নেশন ফুলটাও চুলে গুঁজে নিতে পার।'

প্রহার সহ্য যদি বা করতে পারি, প্রহসন সহ্য করতে পারি না কিছুতেই। হাতিয়ারের চেয়ে অনেক বেশী জখম করে ঠাট্টা। আমি শ্রীনবদ্বীপ মহাস্তি পাগল হয়ে উঠলাম। বৈষ্ণব ধর্মের উপযুক্ত অহিংস ভাব ছেড়ে হিংস্র রকমের কোন একটা কিছু করতে যাব, এমন সময় সিঁড়িতে খুটখুট করে কোন মেয়েলী জুতোর আওয়াজ দৌড়ে উঠে

আসছে শুনতে পেলাম। আমাদের নৈশ ডুয়েল যুদ্ধের শুরুতেই এরকম ভাবে রমণীর অনধিকার প্রবেশ আমরা কেউই চাইলাম না। তার উপর ডন ত মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে তার শিকার কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। আমিও মরি যদি ত লড়াই করেই মরব! কোন মেয়ের গাউনের আড়ালে লুকিয়ে বেঁচে যেতে রাজী নই।

ডন ছুটে গেল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে। কিন্তু তার আগেই ছুটে ভেতরে এসে ঢুকল জলভরা চোখে আলুথালু কাপড় আর চুল নিয়ে ম্যাডোরিনা।

(৫)

কোন একটা দুর্বার আকর্ষণে এই দুরন্ত শীতের শেষ রাতেই ট্যাক্সি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম বুয়েনসের সন্ধানে। ডোরির কাছেই জানতে পেরেছিলাম যে, সে শুধু যে তার ঘরে নেই তা নয়, তার পোশাকের আলমারিটা অগোছাল আর খোলা পড়ে রয়েছে। ছাত্রদের কাছে বিদেশে পোশাক ছাড়া দামী বা দরকারী জিনিস কিই-বা থাকতে পারে? তাই বুঝলাম যে, সে হৃদয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আজ রাত্রেই মাদ্রিদ ছেড়ে কোথাও চলে যাচ্ছে।

বেচারী ডোরি। সে ওই গভীর নিশীথে একাকিনী সকলের অলক্ষিতে ট্যাক্সি করে বেরিয়ে এসেছিল ডনের হাত থেকে বুয়েনসকে বাঁচাতে। ম্যারাথন নাচ থেকে ওরা দু'জন আর সবাইকে সঙ্গে না নিয়েই ফিরে এসেছিল। ওর বাবা-মা বাড়ী ফিরে ওকে শুধু চুপচাপ করে কাঁদতে দেখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও কোন উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ঘুমোতে চলে গিয়েছিলেন। ডন ফিরল তারও পরে এবং বোনকে এ অবস্থায় দেখে রেগে জ্বলে উঠল। রাগে অন্ধ অন্ধ-

বয়সী ভাইয়ের হাতের ছুরি ডোরির চোখ এড়ায়নি। সে যে চুপিচুপি নীচে নেমে এসে বাড়ীর মোটরটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, তা বুঝতে পেরে ডোরিও পথে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বুয়েনসের বাড়ীতে যায়। সেখানে তাকে না পেয়ে আমার বাড়ী খুঁজে বেরে করে এখানে আসতে আর একটু দেরি হলেই আজ ভয়ানক বিপদ ঘটে যেত আর কি।

বেচারা ডন। সে এখন তার পাগলামি খতম করে দিদির সঙ্গে নিজেদের মোটরে করে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু লজ্জায় আমার দিকে বা তার দিদির দিকে তাকাতেও পারছে না। তাদের তুলে দিয়ে আমি ডোরিরই আনা ট্যাক্সি করে উর্ধ্বশ্বাসে রেল স্টেশনে গেলাম। সেখানে বুয়েনসের কোন সন্ধান পেলাম না। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোন ভারতীয়ই স্টেশনে আসেনি। বুঝলাম এবার সন্ধান নিতে হবে বিমানঘাঁটিতে।

গেলাম এয়ার-পোর্টে। ভোররাত্রে একটা প্লেন যাবে প্যারিসে, সেখান থেকে নিশ্চয়ই বন্ধু জলপথে বা বিমানপথে কোথাও চলে যাবে —সম্ভবতঃ নিজের দেশেই ফিরে যাবে।

আমার অনুমান মিথ্যা হল না। সে সময় এয়ার-পোর্টের 'রিস্তোরান্তি'তে মাত্র কয়েকজন লোক রয়েছে। সবারই সামনে মদের গ্লাস। এক কোণায় ওভারকোট মুড়ি দিয়ে সামনে আভাঙা মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে আছে কে? না, আমারই বন্ধু বুয়েনস। বুঝলাম, মদ আনিয়েও তা পান করবার মত মতি তার হয়নি। অর্থাৎ মনে চলেছে ঝড়!

আমায় সে লক্ষ্যই করেনি। হঠাৎ তার কাঁধে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা হাত এসে পড়ায় সে চমকে উঠে দেখল আমাকে। দেখে সে আরো বেশী আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, 'সুয়োভো, এ কি? তুমি এখানে?'

আ। হ্যাঁ। কিন্তু তুমিও এখানে কেন?

বু। ঠিক যে কেন, তা বোধ হয় নিজেই জানি না।

আ। আশ্চর্য! তুমি নিজেও যদি জান না, তবে জানবে কে?

বু। জান, নিজের খবর সব চেয়ে কম নিজেই জানতে পারা যায়। আমার মন কি আমি জানি ঠিক করে?

সোজা কথায় ফিরে এলাম। বললাম, 'এই শীতের মধ্যে ওসব হেঁয়ালি দর্শনতত্ত্ব রাখো। বলো, তুমি দেশে পালাচ্ছ কেন?'

ম্লান হেসে সে বলল, 'দেশে পালাচ্ছি যে তা ঠিক নয়; পালাচ্ছি নিজের মনের কাছ থেকে।'

বাধা দিয়ে বললাম, 'না, তা নয়, পালাচ্ছ ডোরির কাছ থেকে। তাকে তুমি আজ কাঁদিয়ে তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছ। যে আশা তুমিই তাকে ও তার পরিবারের সকলকে দিয়েছিলে, তা ভেঙে দিয়ে তুমি পালাচ্ছ।'

একটু ক্ষণ চুপ করে রইল সে। তার হাতের নীলার আঙটিটার দিকে সে চেয়ে রইল। তারপর খুব মৃদুস্বরে সে বলল, 'আমি যদি কোন আশা দিয়েই থাকি, সে আশাকে চরমভাবে গড়ে তুলে তারপর ভেঙে দেওয়ার চেয়ে এই বোধ হয় ভাল।'

অসহিষ্ণু ভাবে বললাম, 'কিন্তু ভেঙে যে দিতে হবে, তা তুমি মনে করছ কেন? তুমি বোধ হয় জান না, আজ তুমি তাকে ছেড়ে আসার পরও সে এই গভীর রাত্রে সামাজিক নিয়ম ও নিষেধ না মেনে ট্যাক্সি করে ছুটে এসেছিল তোমার ঘরে। তোমায় ছোরার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। কতখানি ভালবাসলে প্রত্যাখ্যাতা হবার পরও এমন ভাবে একটি মেয়ে নিন্দা আর কেলেঙ্কারির ভয় উপেক্ষা ক'রে একজনকে বাঁচাতে ছুটে যায়, তা কি তুমি বোঝ?'

চোখ নীচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'বুঝি, বন্ধু। বুঝি বলেই ত তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি।'

চটে গিয়ে বললাম, 'খুব ভাল করেছ!'

প্রতিবাদ না করেই সে বলল, 'হ্যাঁ, ভালই করেছি। সে যে এত ভালবাসে, তাই তার প্রতি কর্ত্তব্য করতে আমি বাধ্য।'

ব্যঙ্গের স্থরে বললাম, 'তাহলে এবার থেকে পৃথিবীতে সব দম্পতি ও বিবাহার্থী যুবক-যুবতীরা তোমার মত কর্ত্তব্য করতে শুরু করুক।'

ম্লান ছুটি চোখ আমার চোখের উপর এসে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। অপার, অতল ব্যথায় আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি সে-দৃষ্টি সইতে না পেরে, মুখ সরিয়ে নিয়ে শুনতে লাগলাম।—

'তুমি কেন, আজ পৃথিবীর সব সাধু লোকই আমার ব্যাপার জেনে আমাকে ছি-ছি করবে। আমি তা জানি। তবুও নিজেকে দোষী করতে পারছি না। কেন, তা কেউ বুঝবে না। কিন্তু যদি তোমায় এখন বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারি, তাহলে হয়ত কোনদিন ম্যাডোরিনাকে তুমি বুঝিয়ে দেবে। সেই আশায় খানিকটা শান্তি নিয়ে চলে যেতে পারব। ম্যাডোরিনাকে আমি সত্যিই যখন ভালবাসলাম, তখনি বুঝলাম যে অন্যায় করেছি।'

বলে উঠলাম, 'তা ঠিক; সিংহলের জঙ্গলে উদ্যান লতা মানায় না।'

বাধা দিয়ে সে বলল, 'না, সেজন্য নয়। আমাদের দেশে সিংহলী নারকেল ও হিস্পানী কমলা ছু-ই সমান ভালভাবে মানাতে পারে। কিন্তু সেজন্য নয়। এই সোজা কথাটা তুমি বোঝ না কেন, মন্টি, যাকে ভালবাসি তাকে ঠকাতে পারি না।'

'তাই তাকে ছেড়ে এলে?' তার দিকে পরিপূর্ণ ভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, তাই তাকে ছেড়ে এলাম—' উত্তর দিল সে।

বননায়কের উপর একটা কি-রকম আক্রোশ এসে গিয়েছিল। বললাম, নিষ্ঠুরভাবেই বললাম, 'রিনাকেও সেজন্যই ছেড়ে এসেছিলে বোধ হয় ?'

অকুণ্ঠিত স্বরে সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ—ঠিক সেজন্যই, ঠিক সেজন্যই মন্টি! ঠিক সেজন্যই আমি চিরদিন নীড় রচনার স্বপ্ন নিয়ে অসীম নীলাকাশের সাধনা করে যাব। কিন্তু হয়ত আশ্রয় পাব না কোথাও। বিরহের বেদনায় আমার আকাশ নীল হয়ে আছে; মিলনের অরুণিমা কোনদিন ফুটে উঠবে না সেখানে। আমি থাকব সারা জীবন একা—এ-কা-কী!'

ওর কণ্ঠের বেদনার আভাস আমার মনকেও নরম করে দিল। বললাম, 'কিন্তু কেন, কেন তা করতে যাচ্ছ? তুমি ত ভালবাসা পাবার অসীম সৌভাগ্য পেয়েছ। তবে কেন তুমি সারা জীবন বিরহের বালুচরে কাটাবে? মিলন-তরণী ত তোমার ঘাটে বাঁধাই আছে।'

শেষ রাত্রির তরল আঁধারে ঢাকা মনে হচ্ছে ওকে। ও যেন কত দূরদেশের ওপার থেকে উত্তর দিল, 'ঘাটে বাঁধা আছে, কিন্তু সে ঘাটে ঘটবার নয় মিলন। আমি হচ্ছি উড়ো পাখী—যে শাখায় আশ্রয় নেওয়া উচিত বলে উড়ে যাই, কাছে গিয়েই মনে হয়—এ সে-শাখা নয়, সে বুঝি অন্য কোনখানে। আমার মনের সেই বিদেশিনীকে তোমার দেশের সেই লেখক ঠিকই বুঝতে পেরেছে—সেই চির-বিদেশিনী আমার মানুষের দেশের নয়। সে শুধু একটা স্বপ্ন, পাওয়ার ওপারেই সে থাকবে!'

'সে কথা ত ঠিক নয়, বন্ধু। সে লেখক যা লিখেছে, সেটা সাহিত্যের কথা। জীবনের কথা নয়। তার বিদেশিনী হচ্ছে স্বপ্ন,

সত্য নয়। কিন্তু তোমার জীবন, বা রিনা, বা ম্যাডোরিনা কেউই স্বপ্ন নয়। তারা সত্য, জীবন্ত সত্য। তুমি যে রিনার চিঠি পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলে তার কারণ হচ্ছে যে, তার ভালবাসাও সত্য ছিল। সেই সত্যই তোমার মনে সাড়া জাগিয়েছে। হয়ত তুমি সেজন্যই দেশে ফিরে যাচ্ছ।'

একটু থেমে আমি আবার বললাম, 'তুমি যদি রিনার মধ্যেই তোমার বিদেশিনীর সন্ধান পাও, তার মধ্যেই যদি তোমার সকল খোঁজা শেষ হয়, তাহলেও আমি সুখী হব। এবং আমি জানি ম্যাডোরিনাও সুখী হবে।'

ভোর রাত্রির তরল আলোর মত হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সে বলল, 'প্রথম যৌবনস্বপ্ন ফুটে ওঠার সময় থেকেই আমার এ মানসবিহার শুরু হয়েছে। রিনা ও ম্যাডোরিনা আমার কাছে একই স্বপনচারিণীর বিচিত্র বিকাশ। আমার আশা নেই যে, রিনাতেই আমার মন তৃপ্ত হবে।'

আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'তবু এ কথা ত ঠিক যে, যেহেতু সে স্বদেশীয়া, তার সংসারের পরিবেশ এত সহজ ও স্বাভাবিক হবে যে, তোমার গোপন মনের অশান্ত বিহার তার সাংসারিক জীবনে কোন ঢেউ তুলবে না। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তুমি সংসারে আসর পেতে মানসে বাসর জাগাতে পারবে। সেই হবে তোমার জীবনের কাছে জয়।'

মুখ নীচু করে বলল সে, 'সেটুকুই হচ্ছে ম্যাডোরিনার উপর রিনার জয়। কিন্তু তবুও এ কথা ঠিক যে, যাকেই ভালবাসি, যার সঙ্গেই সংসারের বাঁধন একসঙ্গে গলায় পরে নিই, অনন্ত সময়-সাগরের ওপার থেকে তার চেয়ে দূরের কোন মায়াময়ী হাতছানি দিয়ে ডাকবে। অবিরাম, অলক্ষিতে। তার আহ্বান উপেক্ষা করব কি করে?'

'উপেক্ষা করো না কখনো। তার আহ্বান যে আসে, সংসারের মধ্যেই যে সংসারাতীতের সাড়া পাও, সেই ত তোমার সৌভাগ্য। সে সৌভাগ্য অক্ষয় হোক তোমার জীবনে।'

সন্দেহের স্বরে সে বলল, 'তুমি কি তাকে ভাগ্য বলে মনে করো, বন্ধু? ম্যাডোরিনার পাশে বসে দেখব রিনার স্বপ্ন, আর রিনার পাশে বসে পাব ম্যাডোরিনার স্পর্শ—এ যে কি জ্বালা, কি পরাজয়, তা তুমি ত বুঝবে না!'

হঠাৎ এ কথার উত্তর দিতে পারলাম না। কিন্তু বন্ধুকে আজ তার সকল সংশয় ও দোলা-দেওয়া মনের অবস্থা থেকে মুক্ত করে বিদায় দিতে হবে। তাই খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললাম, 'সে কথা ঠিক, বুয়েনস, কিন্তু তোমার জীবনে এসেছে দক্ষিণ সমীরণের দোলা। তুমি কেন মনে করবে যে, সে দোলা আসছে কোন একটি নারীর কাছ থেকে। তুমি ত কাউকে শুধু সে বলে ভালবাসতে যাও না। তোমার মনে যে স্বপ্নময়ী বিরাজ করে, তাকেই তুমি দেখ তোমার প্রিয়াদের মধ্যে। কিন্তু সে সুদূরের স্বপ্ন। তাই যারই কাছে থাক না কেন, সে স্বপ্নের হাতছানি আসে দূর থেকে—কাছ থেকে নয়। এ কথা যদি তুমি মনে রাখ, দেখবে রিনার মধ্যেই তোমার সব সন্ধানের অবসান হয়েছে।'

হঠাৎ এয়ার পোর্টের মাইক্রোফোন যন্ত্রের ভিতর থেকে ডাক এল, 'প্যারিসের যাত্রীরা তৈরী হয়ে নিন। প্যান আমেরিকান ক্লিপার এখনি ছাড়বে।'

ব্যস্ত হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, কখন যে লোকজন যাত্রীরা আসতে শুরু করেছে তা এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে গেলাম। বননায়ককে খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব। তার বিদেশিনীর সন্ধান এবার শেষ হোক।

গুরু গর্জনে বিরাট্ 'ক্লিপার' উড়ো জাহাজের ইঞ্জিন জেগে উঠল। বিপুল বেগে 'ক্লিপার' ধেয়ে চলল আকাশে ওড়বার আগে বেগ যোগাড় করবার জন্য। তারপর মাটির মায়া ছেড়ে সে উড়ে গেল বিরহে নীল ভোরের আকাশে—কোন্ অনন্তকালের বিদেশিনীর সন্ধানে।

পাপের অধিকার

লেডি ল্যাভিনিয়া হোয়াইটিংএর চিঠিটা সামনে খোলা পড়ে রয়েছে।

বেশ রাগে অথচ মনের কষ্টে লেখা চিঠি। পড়ে মোটেই বুঝতে দেরি হয় না যে, তিনি ক্ষমতা থাকলে এ ক্ষেত্রে অনেক কিছুই করতেন, কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না। তাই এ বিদেশীকে অসহায়ের শেষ সম্বল মনে করে তাঁর বিশুদ্ধ নীল রক্তের বিশুদ্ধতর ইংরেজ পরিবারের ঘরোয়া কাহিনীর মধ্যে মাথা গলাতে অনুরোধ করে নিমন্ত্রণ করেছেন। কুড়ি বছর আগেকার ইংলণ্ডে এরকম একটা ব্যাপার কে ভাবতে পারত ?

লেডি হোয়াইটিংএর আমার শরণ নেওয়ার বড় কারণ এ নয় যে, তিনি আমায় তাঁর একমাত্র সন্তানের অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করেন। বড় কারণ হচ্ছে এই যে, সে পুত্ররত্ন আমাদের গান্ধীজীর একটি বাণীর দোহাই দিয়ে নিজের কাজের সমর্থন করছে। সে বাণীটি আমার নজরে কখনো পড়েনি এর আগে। ফ্রাঙ্ক হোয়াইটিং আমার বন্ধু বটে, কিন্তু আমার দেশের নমস্য নেতার প্রতি যে এত তার শ্রদ্ধা, তা এর আগে তার প্রাণের বন্ধুরাও জানত না। আমি ত কোন্ ছার।

মাননীয়া লেডির ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি আমায় লিখেছেন যে, আমার অপরিচিতা হলেও তিনি একান্ত অসহায় অবস্থায় আমায় লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি জানেন যে, আমি তাঁর ছেলে ফ্রাঙ্ক ও ছেলের বন্ধু লিও'র বন্ধু। কাজেই আমি নিশ্চয়ই তাঁর এই ঘোর বিপদে সাহায্য করব, এই ভিক্ষা তিনি করছেন। 'উইলিয়াম দি কন্‌কারার' তাঁর বিরাট্ সম্মানিত বংশের প্রথম দণ্ডটিকে রাজদণ্ড

প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে এনেছিলেন। সেই বংশের ঐতিহ্যে ভরা ইতিহাসের পাতায় এমন কাণ্ড কখনো হয়নি, যা এবার হতে চলেছে। অতএব তিনি কোনদিকে পথ দেখছেন না। ফ্রাঙ্ক, তাঁর একমাত্র ফ্রাঙ্ক যে, এমন একটা কাণ্ড করতে যাবে, তা তিনি 'উইলিয়াম দি কন্‌কারারে'র সময় থেকে আজ পর্যন্ত কখনো সম্ভব বলে মনে করতে পারেন না। ভাবতে গিয়েই তাঁর হার্ট 'প্যাল্‌পিটেট' করছে অর্থাৎ খাঁচায় পোরা পাখীর মত ছটফট করছে।

গান্ধীজী তখন সবে মাত্র বিলেতে এসেছেন। উদ্দেশ্য, রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধান। কিন্তু রাজনীতির চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ঋষির মত জীবন। ইংলণ্ডের লোক অঞ্জলি ভরে পান করছে তাঁর অমৃত বাণী; তার রাজনীতির দিকে সাধারণের তেমন নজর নেই।

ফ্রাঙ্ক গান্ধীজীর সেই সব বাণীর মধ্যে একটির শরণ নিয়েছে। মনে পড়ছে না, কোন্ দিন তিনি সে কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমার সুবোধ সুশীল বন্ধুটি জোর গলায় তার ডাকসাইটে রাশভারী মায়ের সামনে মাথা তুলে—জীবনে এই প্রথম মাথা তুলে—বলেছে যে, গান্ধীজী বলেছেন সকলেরই পাপের অধিকার আছে, যদি সে পাপ মহৎ হয়। ফ্রাঙ্ক যদি ভালবেসে পাপ করে থাকে, সে পাপে তার অধিকার আছে।

লেডি ল্যাভিনিয়া হোয়াইটিং সে কথা সহ্য করতে পারছেন না কিছুতেই। চারদিকে চেষ্টা করে তিনি বিফল হয়েছেন। এখন ভাবছেন যে, আমি যেহেতু গান্ধীজীর দেশের লোক, আমি নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্ককে বোঝাতে পারব যে, গান্ধীজীর এই বাণী তাঁর ছেলের সম্বন্ধে খাটে না। সে সহজ কথাটা লেডি তাকে বোঝাতে পারেন নি। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই পারব।

উইলিয়াম দি কন্‌কারারের সময়কার নিখুঁত শ্বেত বংশ-দণ্ডে যেন কালি না লাগে—সে ভার উইলিয়ামের বিজিত ইংলণ্ডের জয়-করা ইণ্ডিয়ার ছেলেকে চেষ্টা করতে হবে। এই তাঁর একান্ত অনুরোধ।

মনে মনে না হেসে পারলাম না। ঠিক আমাদের দেশের বল্লাল সেনের সময়ে কুলীন চূড়ামণিদেরই মত হোয়াইটিং বংশের অহংকার। উইলিয়াম কবে নয় শ বছর আগে ইংলণ্ড জয় করেছিলেন, সে কথা আজ ইংলণ্ডের কেউই মনে রাখবার সময় পায় না। লেডি ল্যাভিনিয়া নিজেও না। কিন্তু ঠিক আমাদেরই মত বিয়ের সময় নীল রক্ত মনের আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে যায়। বার বার এই নিকষ কৌলীন্যের কথা তোলার মধ্যে একটা অসহায় কান্নার রেশ শুনতে পেলাম।

লিও আমার মুখের দিকে প্রশ্ন ও আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। ঘরের মধ্যে আলো নেই। সন্ধ্যা যে কখন এসে গেছে, তা আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি। কেবল ঘরের চুল্লীর মধ্যে বাতাসের টানে টানে আগুনের শিখাগুলি হঠাৎ উপরের দিকে হাত তুলে আমাদের নীরবতাকে লক্ষ্য করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

লিও চিঠি নিয়ে এসেছে। বেচারী লিও! গত ক'দিন ধরে মায়ে আর ছেলেতে এই ঝগড়ার মাঝখানে পড়ে সে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। আজ সে-ই বন্ধুর মায়ের অনুরোধে আমাকে সে গোলমালের মাঝখানে টেনে নিতে এসেছে। কিন্তু আমি কি করব?

আমি চিরকাল ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। প্রেম ব্যক্তিত্ব-বিকাশের একটি বড় রকমের পথ। আমি কি করে বলব যে, এই ব্যাপারে ফ্রাঙ্কের উচিত হবে তার মায়ের কথা শোনা? নিজে যা বিশ্বাস করি, তার উল্টো রকমের আশ্বাস কি করে দিয়ে আসব তার মাকে? তবে কি আমার যাওয়া উচিত হবে?

কিন্তু ওই 'বিজয়ী উইলিয়াম' আমায় বিজয় করল। ভাবলাম যে, দেখে আসি উইলিয়ামের বিজয় দণ্ড এই দ্বন্দ্বে কেমন ভাবে অম্লান মহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে একটা নিষ্ঠুরতা সামলিয়ে নিয়ে এই বনেদী ঘরের নাটিকায় অংশ নিতে রাজী হলাম। ভারত-বিজয়ী ইংলণ্ডের বিজেতা উইলিয়ামের এক ওমরাহের বেগমকে একবার দেখে আসা যাক।

তা ছাড়া বন্ধুর মায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার মত অশ্রদ্ধা আমার মনে নেই।

(২)

শুনেছিলাম, তিনি রাম ডাকসাইটে। লণ্ডনের সোসাইটি মহল বলে যে, ইংলণ্ডের সমর-সচিবের পদ তিনি অলংকার করলে সমুদ্রের ঢেউগুলিকে ইংলণ্ড আরো ভালো করে শাসন করতে পারত। সে দেশে এখন টাকা আর কুল বেশীর ভাগ সময়ই একই লোককে আশ্রয় করে বসে নেই। অনেকটা আমাদের দেশের মতই। প্রাচীন জমিদারির বনেদিয়ানা আর নতুন ব্যবসাদারের টাকার গরম একই লোকের মধ্যে দেখা যায় না।

কিন্তু লেডি ল্যাভিনিয়ার কথা আলাদা। স্বামীর রেখে-যাওয়া সামান্য সম্পত্তি ছেলের নাবালকত্বের সময় তাঁর হাতে পড়ে নানা কৌশলে এখন বংশমর্যাদার সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে। অতএব তাঁকে সমীহ করে চলবার আরো কারণ আছে। ভীষণ দুঃসাহস আমার বন্ধুর। সে কিনা বিয়ে করতে চায় থিয়েটারের সামান্য এক অভিনেত্রীকে। বলে কি না যে, এটা যদি পাপ, তবে গান্ধীজীর ভাষায় তার এ পাপে অধিকার আছে।

'উইলিয়াম দি কন্‌কারারে'র সময় থেকে এ পর্যন্ত লেডি

ল্যাভিনিয়ার ঊর্ধ্বতন কোন পুরুষে এ হেন কাণ্ড করেনি। তিনি নিজে পরলোকগত স্বামীর সম্পদ ও সম্মান বাড়িয়ে এসেছেন এতকাল। এখন কি তিনি নিজের ছেলেকে সে সব নষ্ট করে দিতে দেবেন একটা খেয়ালের বশে? মাতৃস্নেহের কি কোন দাম নেই? পুরস্কার নেই?

বলতে বলতে মাননীয়া লেডি ল্যাভিনিয়া দুঃখে ক্ষোভে চোখের জলে নুয়ে পড়লেন।

তাঁর বংশ-মর্যাদার মতই প্রাচীন ও অভিজাত ওক-কাঠের প্যানেলে ঢাকা সুন্দর ড্রইংরুমে ননীর মত কোমল সুখাসনে বসে বংশতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই দ্বন্দ্ব দেখতে লাগলাম। ঘরের কোণে বিশাল 'লগ্ ফায়ার' জ্বলছে। কয়লা বা তার চেয়ে বেশী আধুনিক বিদ্যুতের চুল্লী লেডি ল্যাভিনিয়ার বনেদী ধারাকে ক্ষুণ্ণ করে নি। প্রাচীনকালের মতই ব্রিটিশ কাঠের উত্তাপ লক্‌লকে শিখায় ফুলে ফুলে উঠেছে। তারই পাশে বসে লেডি ল্যাভিনিয়া। সামনে বসে আমি আর লিও। নীরব প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ফ্রাঙ্ক। ঘরের মেঝের পুরু সোনালী ও রক্তের মত টকটকে কার্পেটটিতে তার দৃপ্ত পদক্ষেপের চিহ্ন এখনো ছড়িয়ে আছে।

লেডি ল্যাভিনিয়ার সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের দীপ্তি সবে যাই যাই করছে। অভিজাতের সযত্নে ধরে রাখা রূপের লাবণ্য নয়, তাকে ধরে রাখার চেষ্টার একটা অসহায়তা তাতে ফুটে আছে। অবাধ মেলামেশার সমাজের স্তুতিবাদ শুনে শুনে হয়রান তাঁর রূপ হাসির মত জেগে আছে। কিন্তু সে কান্তির মধ্যে কান্তাকে নয়, মাতাকে দেখলাম। উইলিয়াম দি কন্‌কারারকে মনে মনে ক্ষমা করলাম।

খানিকক্ষণ বিবশ হয়ে থেকে তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন, 'ডক্টর, বন্ধুমহলে তোমার পপুলারিটির খবর আমি জানি। তুমি যখনি এ বাড়ীতে আস, তোমায় আমি এর আগে ভাল করে না দেখলেও বাড়ীর

সকলেই তোমার কথা আলোচনা করে। সকলেই তোমার বুদ্ধিতে মুগ্ধ। তুমি ফ্রাঙ্কের বন্ধু, লিওর বন্ধু, তুমি আমার ছেলেকে অ্যাক্‌ট্রেসের হাত থেকে বাঁচাও। আমার ছেলে,—আমার ছেলে!'

কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, 'এ সম্বন্ধে লিওর চেষ্টা যখন সফল হয়নি, আমার দ্বারা কি কিছু হবে?'

লিওনার্ড মৃদু স্বরে বলল, 'আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে আমায় ছেলেবেলা থেকে জানে। আমার কথা তাই ওর কাছে তেমন জোরালো নয়। কিন্তু তুমি নতুন বন্ধু, বিদেশী বলে তোমার কথা ও তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ওর কাছে বেশী দামী হতে পারে।'

হেসে বললাম, 'কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, ও নিশ্চয়ই বলবে যে, আমাদের দেশে জাতিভেদ দূর করবার আপ্রাণ চেষ্টা সমাজ সংস্কারকরা করছে। সে অবস্থায় ওরও এই জাতির গণ্ডি দূর করবার চেষ্টাকে বাধা দেওয়া আমার পক্ষে অন্যায়।—তখন আমি কি বলব? এও ত একটা জাতিভেদ ছাড়া আর কিছু নয়।'

বন্ধুর মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'সে কি এক জিনিস হল, ডক্টর? তোমাদের জাতিভেদ হচ্ছে জন্মগত।'

একটু আহত হয়ে উত্তর দিলাম, 'আপনাদেরও ত তাই।'

বলেই একটু আঘাত করবার প্রলোভনও সংবরণ করতে পারলাম না। ফস্ করে বলে বসলাম, 'আপনাদের উইলিয়াম দি কন্‌কারারের সময়কার প্রাচীন বংশ-মর্যাদাটাও ত জন্মগত। তা না হলে আজকের দিনের ইংলণ্ডে আরো অনেক বড় বড় ঘরেই ত অভিনেত্রী স্ত্রী আসছে। ব্যবসা বা জীবিকা ত তাদের অন্য সমাজের লোকের সঙ্গে বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।'

ওই ইংলণ্ড-বিজয়ীর উল্লেখে লেডি একটু লজ্জা পেলেন। বোধ হয়, তাঁর খেয়াল হল যে, তিনি তাঁর চিঠিতে যে রকম বার বার তাঁর

কথা উল্লেখ করেছিলেন, তা ওদেশের সুরুচির নিয়মে ঠিক শোভন হয়নি।

তিনি বললেন, 'ডক্টর, তুমি আমার ছেলের মত। আমি যদি অত্যন্ত অসহায় বোধ করে ওরকম কিছু লিখে থাকি, তা ক্ষমা করো। এখন বিপদে পড়েছি বলেই ত ওসব প্রাচীন কথা বার বার মনে আসছে। কিন্তু তুমি কি আমার ছেলের মন সারিয়ে দিতে পার না? মুক্ত করতে পার না তাকে এই মোহ থেকে?'

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট উপাধির জন্য পড়ি বলে বন্ধুমহলে সকলে আমাকে ডক্টর বলে ডাকে। যে জিনিস এখনো পাইনি তার জন্য এই আগাম অভিনন্দন বন্ধুদের প্রীতির চিহ্ন বলেই স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু এখানে ডাক্তারদের 'ডক্' বলে সংক্ষেপে ডাকা হয়। তা বলে আমি ত আর ডক্ হয়ে যাইনি। আর হৃদয়ের উপর ডাক্তারী? অত বড় হৃদয়হীন আমি নই।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে লেডি আশার বদলে আশঙ্কায় আকুল হলেন। বললেন, 'ডক্, তুমি কি মনে করছ যে, আমার এই ব্যাকুল অনুরোধ অন্যায় হচ্ছে?'

এতক্ষণ আমি শুধু কথা শুনেই এসেছি। ফ্রাঙ্কের অবিচল মত বা তার মায়ের বিচলিত ভাবে বাধার মধ্যে কোন অংশ নিই নি। অভিনেত্রী ইভন মার্শের এ বংশের বধূ হবার যোগ্যতা আছে কিনা বা তাতে কি অন্যায় হবে সে সম্বন্ধেও কোন আলোচনা করিনি। শুধু নীরবে মা আর ছেলের তর্কের মধ্যে দুই পুরুষের মধ্যে যে চিরকালের মতবিরোধ আছে, তারি প্রকাশ দেখে যাচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম যে, পৃথিবীর সব দেশেই মানুষের মন প্রায় একই ভাবে চলে। ইতিহাস আর আবহাওয়ায় সামান্য তফাত হয় মাত্র।

এবার আমার উত্তর দেবার পালা। খুব স্থির ভাবে প্রত্যেকটি কথা

ওজন করে বললাম, 'এটা এমন ব্যক্তিগত ব্যাপার যে, এতে আপনার কাছে যা অন্যায় মনে হবে, তা আপনার ফ্রাঙ্কের কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে তার মধ্যে টেনে আনেন, তাহলে জিনিসটা আরো বেশী-ই জট পাকিয়ে যাবে।'

'তা বলে তুমি এমন একটা অঘটন ঘটতে দেবে? একজন যদি অন্যায় করতে যায়, তাকে তুমি বাধা দেবে না, তার অন্যায়টা বুঝিয়ে দেবে না?'—বলতে বলতে তাঁর নাক ফুলে উঠল।

'আর সে যদি এটা অন্যায় বলে না মনে করে?'

'সেজন্যই ত বলছি। সে তার অন্যায়টা বুঝতে পারছে না। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সে কাজটা তার বন্ধুদের কর্তব্য। তুমি নিশ্চয়ই এই কর্তব্যে বিমুখ হবে না।'—এই পর্যন্ত বলে লেডি ল্যাভিনিয়া হাঁপাতে আরম্ভ করলেন।

'কিন্তু বন্ধুরা যদি তা কর্তব্য না মনে করে?'—এই প্রশ্ন করেই নিজের মনে একটু অপরাধ বোধ করলাম। সত্যই ত আমি মাতৃস্থানীয়া এক সম্মানিতা মহিলার সঙ্গে শুধু তর্ক যে করছি তা নয়, তাঁর ক্ষত স্থানে আরো আঘাত করছি। এ কথা সত্য যে, আঘাত করা যৌবনের ধর্ম, কিন্তু সংযমই সে ধর্মকে সুন্দর করে তোলে।

তাই তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিলাম। বললাম, 'দেখুন, এ কথা আমি বলছি না যে, আমি ফ্রাঙ্কের সমর্থন করছি। আমি শুধু—'

আর তিনি বলতে দিলেন না। কাতর ভাবে বলে উঠলেন, 'ঠিক কথা ডক্টর, তোমার উপযুক্ত কথা। আমি জানি, তুমি ফ্রাঙ্ককে সমর্থন করছ না। তোমার বাবা-মা ও তোমাদের দেশে অন্য কেউ নিশ্চয় এরকম কাজকে সমর্থন করতেন না। তোমাদের হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে অনেক সুবিবেচনা দেখিয়েছে।'

আমার পুরোনো পন্থী দেশ ও তার চেয়ে বেশী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কথা তোলায় মন আবার খাপ্পা হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, ভাঙুক, ভাঙুক সব সমাজের ভিত্তি, সব বাজে কুসংস্কার। সব ভেঙে চুরমার হয়ে মানুষ এক হয়ে যাক।

তাই প্রতিবাদ করে বললাম, 'আপনি ভুল বুঝছেন। আমাদের দেশ আর ধর্ম যৌবনের উপর, মনের স্বাভাবিক বিকাশের উপর বহু অবিচার করে এসেছে এতদিন। তাই সে-সব বাঁধনে আজ ভাঙন ধরেছে। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, আপনাদের দেশেও সে-সব বাঁধন এখনো বজায় রয়েছে। দেশে থাকতে তা জানতাম না।'

লিও পাশ থেকে আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে একটা ইশারা দিল। বুঝলাম যে, আবার ক্ষতস্থানে আঘাত দিচ্ছি। চুপ করে গেলাম।

লেডি ল্যাভিনিয়া একেবারে ভেঙে পড়লেন। তিনি বললেন, 'তুমি তাহলে ফ্রাঙ্ককে বোঝাবে না? গান্ধীজীর বক্তৃতার কথা সেই যে পাপের অধিকার, তা যে এক্ষেত্রে নেই—তা তুমি বোঝাবে না? আমার ফ্রাঙ্ক, আমার ফ্রাঙ্ককে তুমি পর হয়ে যেতে দেবে?'

তাঁর দুটি নীল নয়নের জলই আমার হয়ে উত্তর তৈরি করে দিল। আমি স্বীকার করলাম যে, তাঁর মত ও মনের ইচ্ছা আমি ফ্রাঙ্ককে বুঝাবার চেষ্টা করব। মনে মনে ভাবলাম, এতে যদি আমার কোন অপরাধ হয় ত হোক। আমি সে বোঝা বহন করব সানন্দে। যে মতকে আমি সত্য বলে মানি না, তাকে সমর্থন করতে যাওয়া প্রতারণা। সে প্রতারণা পাপ। কিন্তু আমারও নিশ্চয়ই পাপের অধিকার আছে।

(৩)

'হ্যাঁ, আমারও নিশ্চয়ই পাপের অধিকার আছে।'—জোর গলায় নয়, কিন্তু জোরালো ভাবে বলল ফ্রাঙ্ক।

'কিন্তু গান্ধীজী ত এরকম ক্ষেত্রের কথা বলেন নি।'—বললাম আমি। 'তিনি স্বদেশ প্রেমের কথা বলেছেন। মানুষের প্রেম সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কারণ, তা কতখানি সত্য, আর কতখানি টেকসই, তা আগে থেকে ঠিক করে বলা যায় না।'

উত্তেজিতভাবে উত্তর দিল ফ্রাঙ্ক, 'সে কথা সত্য নয়। আমি যে ইভনকে ভালবাসি, তা তুমি না জানতে পার, কিন্তু আমি জানি।'

'অবশ্যই তুমি জান এবং তোমার চেয়ে ভাল করে কেউ জানতে পারে না। কিন্তু আজ তাকে ভালবাস বলেই যে পাঁচ বছর পরেও তেমনি ভালবাসবে, সে কথা ত কেউ হলপ করে বলতে পারে না। যদি তখন দেখ যে—তাকে ভালবাস না, তখন কি মনে হবে না যে, মায়ের চিরকালের ভালবাসাকে ক্ষণিকের ভালবাসার জন্য অবহেলা করেছ?'

চুপ করে রইল ফ্রাঙ্ক। চোখে তার উদাস দৃষ্টি, মুখে তার উদার শান্তি। চুপ করে থেকে সে বলল, 'না ডক্‌, যদি তেমন হয় কখনো, তাহলেও আজকের সত্য ত আজ সত্যই থাকবে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তা যখন জানি না, তখন বর্তমানকে আমি অস্বীকার বা অসম্মান করতে পারব না।'

অন্য পথ ধরতে হল। হার মেনে বললাম, 'কিন্তু ইভন যে তোমাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসে, তার ঠিক কি? সে আজ হয়ত তোমার কুলীন পদবী আর টাকার জন্য তোমাকে ভালবাসছে। যখন টাকা আর বংশ দুইয়েরই স্বাদ তার কাছে পুরোনো হয়ে যাবে, তখন হয়ত আজ যাকে ভালবাসা মনে করছ, তা আর থাকবে না।'

দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে ফ্রাঙ্ক বলল, 'লিও যদি এ কথা বলত, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করতাম না। কিন্তু তুমি যখন বলছ, তখন আমি এটাকে ইভনের প্রতি অসম্মান বলে মনে না করে উত্তর দিয়ে দিচ্ছি।'

লিও একটু বিপন্ন বোধ করছিল। সে এতক্ষণে হেসে ফেলল; বলল, 'ডক্, তোমারি জয় হোক। লেডি ল্যাভিনিয়া তোমাকে একটু নেকনজরে দেখেন। আর ফ্রাঙ্ক ত বটেই। আশা আছে, শ্রীমতী ইভনও তোমায় বিশেষ প্রীতির চোখে দেখবেন।'

হালকা ঠাট্টার খাতে এই তর্ককে বইয়ে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। বলে ফেললাম, 'শ্রীমতী ইভন হয়ত আমি ছাড়া আরো বহু ভাগ্যবানকে প্রীতির চোখে দেখেছিলেন। আমি খালি প্রার্থনা করি যে, ফ্রাঙ্ককে যে চোখে তিনি দেখেছেন, সে দৃষ্টি তাঁর অক্ষয় হোক।'

এই ঠাট্টার সুর কিন্তু ফ্রাঙ্ককে ঠকাতে পারল না। ভেতরের ব্যঙ্গকে উপেক্ষা না করে সে উত্তর দিল, 'আমি ত বলেছি যে, আজকের যে সত্য, তাই আমার কাছে পরম সত্য। কালকের জন্য আমি ভাবি না। গতকালের জন্যও না।'

'সত্যি তুমি গভীর প্রেমে পড়েছ। তোমার উদ্ধারের কোন আশা নেই।' বললাম আমি।

'আমার কথা বাদ দাও। আমি ইভনের কথাই বলছি। সে যদি আগে আরো কাউকে ভালবেসে থাকে, তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই। জান না যে, অভিজ্ঞতা আভিজাত্যের চেয়ে বড়? পুরাতন প্রেম অপরিচিত ভীরু প্রেমের চেয়ে?'

বন্ধু লিও ফ্রাঙ্ককে সমর্থন বা সমালোচনা—কি যে করল, ঠিক বোঝা গেল না। সে বলে ফেলল, 'আমাদের সুন্দরীদের গলার মুক্তোর মালার দাম তখনি বাড়ে, যখন তা ব্যবহারের ফলে সাদার বদলে হলদে হয়ে আসে। দুধের চেয়ে মাখনের রং বেশী সুন্দর।'

'সাবাস লিওনার্ড। তোমার শিল্পী মন নিশ্চয়ই লিওনার্ডো দা ভিঞ্চিকেও ছাড়িয়ে যাবে—যদি তুমি এদিকে একটু মন দাও।'

আমার কাছে উৎসাহ পেয়ে সে আরো উপমা দিতে আরম্ভ করল। সে বলল, 'জান, সেই তামাক টানার পাইপ সবচেয়ে বেশী আরাম দেয়, যেটা কিছুদিন ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহারেই জিনিসের স্বাদ বাড়ে, মাদকতা বাড়ে। প্রথম প্রেম অত্যন্ত আনাড়ী, অত্যন্ত অকেজো।'

হাসি ঠাট্টার মধ্যে আমার সাধু উদ্দেশ্যকে হারিয়ে ফেলার ইচ্ছা ছিল না। তাই আসল কথার মধ্যে ফিরে এলাম। উত্তর দিলাম, 'সে কথা ঠিক। কিন্তু প্রেমের বেলা অনাঘ্রাত কুসুমই সবাই চায়।'

'কেন?' তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন করল ফ্রাঙ্ক। 'কেন? শুঁকলে কি শোভা কমে যায়, না সৌরভ উবে যায়?'

'বাস্তব জীবনে তা হয় না বটে, কিন্তু মানুষের মন তবু প্রথম প্রেমকেই আকাঙ্ক্ষা করে। প্রিয়ার কাছে একেশ্বর হতেই চায়। সে জগতে সে ভাগাভাগি বা আপস সহ্য করতে পারে না। ইংরেজীতে একটি কথা আছে না যে, sweet seventeen and yet unkissed? মধুর সপ্তদশী, কিন্তু তবু অচুম্বিতা? তার মানে কি?'

রুক্ষ স্বরে ফ্রাঙ্ক বলল, 'অর্থাৎ তোমার কাছে আপত্তি হচ্ছে আমার বংশ মর্যাদার জন্য নয়, ওর অভিনয়ের জন্য নয়; শুধু অভিজ্ঞতার জন্য?'

আমার হয়ে উত্তর দিল লিও, 'ঠিক কথা। স্ত্রী যদি ভাল হয়, তার পেশা বা বংশের জন্য তুমি যে অসুখী হবে, তা আমরা মনে করি না। যদিও লেডি হোয়াইটিং-এর মত অন্য রকম। কিন্তু ইভনের কোন অতীত পটভূমিকা যদি তোমার ভাবী অশান্তির কারণ হয়, তাহলে আমাদের কিছু বলবার আছে বইকি। অবশ্য তুমি যদি তা সত্ত্বেও বিয়ে কর, মনে কোরো না যে, সেজন্য আমরা তোমার কাছ থেকে দূরে থাকব। কিন্তু তবু তোমার মায়ের কথা ভেবে দেখো।'

আমি যোগ করলাম, 'তা ছাড়া, তোমাদের সমাজেও অভিনয়কে এখনো অনেকে একটু ভিন্ন চোখে দেখে। সে কথা অস্বীকার করতে পার না। এই ত তোমাদের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সেদিন আত্মকাহিনীতে বলছিলেন যে, তিনি তাঁর পাদরী পিতার ঘর ছেড়ে যখন স্টেজে এসে উঠলেন, কি ভীষণ তোলপাড় হয়েছিল তা নিয়ে। চার্চিলের মেয়ের স্টেজে যাওয়া নিয়ে ভিতরে ভিতরে সোসাইটিতে আপত্তি ত কম হয় নি।'

'কিন্তু আমরা কি ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছি না?'

সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'তা যাচ্ছি নিশ্চয়ই। তবে সে এগোনর মধ্যে সবটাই সত্য নয়। আর মতবাদের দিক্ দিয়ে যেমন এগোচ্ছি, মতান্তরও তেমনি বাড়ছে। তার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন সুখ দিচ্ছে, তেমনি অশান্তিও দিচ্ছে। নিজের একান্ত জীবনের মধ্যে তুমি চাও আলোর শোভা, না আগুনের শিখা,—তা মাথা ঠাণ্ডা করে একা বসে ভেবে দেখো।'

তরুণদের এসব বিষয়ে আলোচনা বেশীক্ষণ চলে না। মন কষাকষির সম্ভাবনা তর্কের গলা টিপে ধরে। তাই লিও দেখার কথায় কথা ঘুরাবার একটা সুযোগ পেল। বলল, 'আরে, যাকে আমরা দেখলামই না ভাল করে, তার সম্বন্ধে এত আলোচনা করে লাভ কি? চল না, তার সঙ্গে পরিচয় করে আসা যাক এই শনিবারে। তার অভিনয় দেখার পর, রাত্রে তার সঙ্গে বসে 'সাপার' খাওয়ার বন্দোবস্তটাও ফ্রাঙ্ক করে নিলে ভাল হয়। বিয়ে হোক আর না হোক, আহার-বিহারের পালা বাদ যাবে কেন? কি বল হে, ফ্রাঙ্ক?'

অবশ্য ফ্রাঙ্কের কোন আপত্তি ছিল না। সে ত চাইছিল, যাতে আমরা তার হয়েই তার মাকে বুঝাই। ইভনকে দেখলে আমরা

নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়ে যাব। সন্ধ্যাসংগীতি পালার শেষ অভিনয় রজনী এই শনিবারেই।

(৪)

রিভোলি থিয়েটারে তোফা আরামে বসে আমরা তিন বন্ধু। তিনজনেরই হাতে ফুলের তোড়া। অভিনয়ের শেষে উদীয়মানা অভিনেত্রী-শ্রেষ্ঠা ইভন মার্শের নিরালা কামরায় গিয়ে তাকে উপহার দেওয়া হবে। তার অভিনয়ের জন্য, না বন্ধুপত্নী হিসাবে অভিনন্দনের জন্য—সে প্রশ্ন আমরা মনে আসতে দিইনি। মোট কথা, একজন রূপসী তরুণীকে রঙ্গমঞ্চের মায়াময় আলো আঁধারের মধ্যে একজন বন্ধুর জীবনের আঙিনায় এসে দাঁড়াতে দেখব যখন, তখন তাকে কি দিয়ে অভ্যর্থনা করা যায়? কলেজে-পড়া বিত্তায় এ সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান হয় না। চেনা পরিচিতের মধ্যে কারো অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করে না। তাই ভেবে চিন্তে আমি আর লিও ফুলের তোড়ার উপরই ভরসা করলাম। কি জানি সংকোচ এসে যদি মুখকে চাপা দিয়ে ধরে। ইংরেজীতে ত কথাই আছে: 'Say it with flowers', অর্থাৎ ফুলকে তোমার হয়ে কথা কইতে দাও।

এই বইটার কাহিনী আগে জানা ছিল না। দেখতে দেখতে বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগেকার কাহিনী। একজন জার্মান বনেদী যুবক একটি অপেরা গায়িকার প্রেমে পড়েছিল। দু'জনের প্রণয় কিন্তু পরিণয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। কারণ যুবকের আত্মীয়-স্বজনের বাধা। শুধু তাই নয়, প্রাসিয়ান বংশ-মর্যাদার অহঙ্কার আর সামরিক পদমর্যাদা সমানে সমানে ছাড়া বিয়ে হতে দেয় না। বেচারী তরুণ নায়ককে পদে পদে তার আত্মীয়রা ও মিলিটারী একাডেমির কর্তারা বাধা দিচ্ছেন। বলছেন: তুমি

অসামাজিক প্রেম কর আপত্তি নেই, সামাজিক বিয়ে করতে পারবে না। তাঁরা বলছেন যে, বাইরের জীবনের গোপন প্রেম মানুষকে নেশা দেয়,—তাকে সাময়িক জীবনে সহায়তা করে। কিন্তু সে মদকে তোমার ঘরের মধ্যে কুঁজোর জল হিসাবে দেখতে চেয়ো না। তার জীবনে অপেরার মূর্ছনা তুলেছে যে তরুণী তার হাত ধরে তরুণ কাউন্ট নদীর তীরে সন্ধ্যা-সূর্যকে সাক্ষী রেখে শপথ করল যে পরদিন ভোরেই সে তার বংশ, সম্পত্তি ও চাকরিকে পেছনে ফেলে রেখে প্রেয়সীকে নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যাবে। তার হাতে রয়েছে দু'জনের জন্য পাসপোর্ট আর স্টীমারের টিকিট। হায় তারা জানত না যে, বিধিলিপি ছাড়া আর অন্য কোন ছাড়পত্র জীবনে কাজে লাগে না।

সে সন্ধ্যার সংগীত তাদের জীবনে আর ফিরে এল না। পরদিন সকাল এল নিষ্ঠুর যুদ্ধের রক্তাক্ত আভা নিয়ে—শুধু জার্মানি নয়, সমস্ত পৃথিবীকে ওলট-পালট করে। তার পরের কাহিনীতে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। প্রথম অংশটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

কি অপূর্ব অভিনয়-দক্ষতা শ্রীমতী ইভনের! তার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি, কটাক্ষ, পদক্ষেপ যেন কথা কয়ে উঠছে। যেখানে সে মূক মুখভঙ্গি করছে, মনে হচ্ছে যে সমস্ত থিয়েটারটা গমগম করছে অকথিত বাণীতে। যেখানে সে শুধু রক্তিম অধরোষ্ঠ একটু বঙ্কিম করে তুলছে, মনে হচ্ছে যে হাসির তরঙ্গদোলা হৃদয়কে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে। শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে বিজন নদীতীরে লিণ্ডেন গাছের তলায় সন্ধ্যার অস্তরাগ যেন তারই রূপের ছবি সেজে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সন্ধ্যার কলকাকলী যেন তারই কণ্ঠের তারই চঞ্চল চরণের প্রতিধ্বনি। সে সন্ধ্যার রাণী হয়ে বিরাজ করতে লাগল ইভন মার্শ। তার অভিনয় যেন অভিনয় নয়, অন্তর-ঢালা প্রেমের ছবি। ভারতীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণ

মন নিয়ে মনে মনে ভাবলাম, ওরই অন্তরের রঙে সন্ধ্যারাগকে রাঙিয়ে দিয়েছে। সার্থক হোক ওর জীবনের রঙ।

শেষ দৃশ্যে স্টেজের পেছন থেকে গুরু গুরু কামানের ডমরু-রব ও হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকানর মধ্যে কোথা দিয়ে যে সে সন্ধ্যাসংগীতি মিলিয়ে গেল, তার আর খেয়ালই হল না। প্রথম চৈতন্য হল, যখন ঘন ঘন হাততালিতে থিয়েটার মুখরিত হয়ে গেল, আর দেখলাম স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা হাসিমুখে অভিনন্দন গ্রহণ করছে। তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মধ্যমণির মত বিরাজ করছে রূপসী ইভন মার্শ। সকল আভিজাত্যের সেরা সৌন্দর্যের আভিজাত্যে ঝলমল করছে সে।

আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে থিয়েটারের 'কমিশনেয়ার' অর্থাৎ বিশেষ সাজ পোশাকে সাজান দরোয়ান। হাতে তার একটি কারুকার্য করা থালা, তার উপর একটি চিঠি। আমরা তিন বন্ধু যেন ইভনের নিজের কামরায় এখনি না আসি। সে বড় হয়রান হয়ে আছে। কিন্তু সকালে অর্থাৎ বেলা দশটার সময় রিভোলির রেস্টুরেণ্টে আমরা যেন আসি। তার ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণ। অবশ্য সাধারণতঃ প্রাতরাশের নিমন্ত্রণটা কেউ করে না। কিন্তু সে অসাধারণভাবেই আমাদের সঙ্গে নিভৃত আলাপ করতে চায়।

অসাধারণ নিমন্ত্রণই বটে। আমরা সেজেগুজে দশটার একটু আগেই এসে রিজার্ভ-করা টেবিলে বসে ইভনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু নীল নয়নের উজ্জ্বল হাসির ছটা ছড়াতে ছড়াতে সে এলনা সেখানে। এল তার বদলে নীলাভ একটি খাম মৃদু সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে। যে ছোকরা চিঠি নিয়ে এল, সে কিছুই জানেনা কেন চিঠির লেখিকা নিজে আসতে পারল না।

হাতের কাঁপন সামলাতে সামলাতে ফ্রাঙ্ক চিঠিটা খুলে ফেলল।

আমরা বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে মুখের রঙ বদলিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করে মুখ ফিরিয়ে নিলাম অন্য দিকে। সবই ত বোঝা গেল। জীবনটাই বুঝি অভিনয় মাত্র।

"প্রিয়তম ফ্রাঙ্ক,

তুমি যখন এ চিঠি পাবে, তখন আমি ইংলণ্ডের তীর প্রায় ছেড়ে গেছি। টিলবারি বন্দর থেকে জাহাজ ততক্ষণে ছেড়ে যাচ্ছে স্পেনের দিকে। আমিও তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি অনির্দিষ্ট অলক্ষ্যের দিকে। তুমি আমায় ক্ষমা করো। তুমি আমায় অনুসরণ করো না, এই শেষ ভিক্ষা।

তুমি যেদিন তোমার প্রথম চুম্বনের জন্য আমার ধন্যবাদের প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ দিলে, সেইদিনই বুঝলাম যে, তুমি সংসারে কত অনভিজ্ঞ, কত অপরিণত। কত আদর্শে ভরা তোমার মন! বিশ্বাস কর, আমার সমস্ত সত্তার শপথ—তুমি বিশ্বাস কর যে, তোমায় সত্যই ভালবেসেছিলাম। তোমার বংশমর্যাদা বা সম্পত্তি বা সম্মানের জন্য নয়। তোমার মধ্যেকার তোমার জন্য।

তবু কেন তোমায় ছেড়ে পালাচ্ছি? তোমায় শেষ সাক্ষাতের সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে? জানি যে, তোমার সঙ্গে যদি আবার দেখা হয়, তাহলে তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না। Oh my baby—ওগো আমার বাছা, আমার কিশোর প্রেমিক, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারি কি করে?

তবু যেদিন তোমার মা গোপনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে কেঁদে তোমায় ছেড়ে দিতে বললেন, সেদিন আমি 'না' করতে পারলাম না। তোমায় যদি বিয়ে করতাম, আমিও ত মা হতাম। আমার সন্তানও আমাকে এমনি করে কাঁদাতে পারত। সে কথা ভেবেই, তোমাদের উইলিয়াম দি কন্‌কারারের সময়কার সুপ্রাচীন অম্লান

বংশমর্যাদার কথা ভেবে নয়, আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। কাল রাত্রির অভিনয়ে আমার এখানকার কনট্রাক্ট শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি কিছুদিন গোপনে বিশ্রাম করব আর নিজেকে যাচাই করব। তার পরে কি করব জানি না। শুধু জানি যে, তোমার জীবনপথে যেন আর আমার ছায়া না এসে পড়ে, সেজন্য সাবধান থাকতে হবে।

তুমি যদি আমার উপর রাগ করো, তাহলে হয়ত আমার দূরে চলে যাওয়া সহ্য করা তোমার পক্ষে সহজ হবে। তাই জেনে রেখো— তোমার জীবনে আমি প্রথমা হলেও আমার জীবনে তুমি প্রথম ছিলে না। তুমি পুরুষোত্তম ছিলে কিনা, সে কথা এখন জানিয়ে ত আর লাভ নেই। আর আমার বাইরের যা দেখেছ, সবই ত অভিনয়ের অঙ্গসজ্জা। তোমার অনেক আগেই আমার বসন্ত ফুরিয়ে যাবে। তোমার মায়ের দীর্ঘশ্বাসের আগুন সে ফুরানোকে আরও এগিয়ে দিত। তাই আমি কোনদিন তোমায় বলতে পারলাম না যে—যাও, তোমার মাকে গিয়ে বলে এস যে, তাঁর ছেলে এখন আমার হয়ে গেছে।

আর আমার অন্তরের যা দেখেছ, তাকেও অভিনয় বলেই মনে করে নাও। সন্ধ্যাসংগীতি অভিনয় কি অত মন-মাতান হত, অত সফল হত, যদি না তোমায় ভালবাসতাম ? মনে করে নাও যে, অভিনয়ে যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরণা পাবার জন্যই আমি জীবনেও অভিনয় করতে গিয়েছিলাম ক্ষণেকের জন্য। তা না হলে, আমি ত অত বড় অভিনেত্রী নই।

ওগো, আমি নিজেই জানি না এখনো আমি তোমায় কতখানি আঘাত দিচ্ছি, এ কথা বলে। তোমার জীবনে প্রভাতসংগীতির পরিবর্তে সন্ধ্যাসংগীতির করুণ ঝংকার যদি আজ বাজে, তার জন্য আমায় ক্ষমা করো। আর মনে করো, অভিনেত্রীরা এরকমই হয়।

সুদূর ভারতবর্ষের হাঁটু পর্যন্ত কাপড়-পরা সন্ন্যাসী গান্ধীজীর 'right to sin'—পাপের অধিকারের কথা তুমি প্রায়ই বলতে। সেই অধিকারেই তোমায় এই কষ্ট দিয়ে গেলাম। তোমাকে ভালবাসা পাপ নয়। মোটেই নয়। কিন্তু তোমাকে দুঃখ দিয়ে পালান পাপ। সে অধিকার এই একমাত্র ও শেষবার আমি খাটিয়ে যাচ্ছি।

আমার সময় শেষ হয়ে এল। তোমার সামনে আমার রঙ্গমঞ্চের উপর এই শেষ যবনিকা পড়ে যাক। বিদায়, ফ্রাঙ্ক, বিদায়! পুনর্দর্শনায় নয় কিন্তু। ইতি—

যে তোমার হতে পারত

ইভন।"

ভাসিয়ে দিলাম মালা

রোম থেকে রমনা অনেক দূর; কতদূর তা ভূগোল থেকে হিসাব করা যাবে না।

তবু সে হিসাবটা বার বার মনের মধ্যে আসছে। আচ্ছা, ইটালি থেকে ইণ্ডিয়া কতদূর? এখন ত আর ইণ্ডিয়া নেই বোধ হয়। হয়ত হিন্দুস্থান হয়ে গেছে। দেশের চিঠিতে খবর পেয়েছি যে হিন্দুস্থান পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেছে।

রোমের খবরের কাগজে বড় বড় হরফে দেখেছিলাম খবরটা। কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। কেমন করে হবে? কেমন করে বিশ্বাস করব যে, একটা কলমের আঁচড়ে নিজের দেশে বিদেশী হয়ে গেলাম? যে দেশকে নিজের বলে জানি আর মানি, তা অত সহজেই আমার পক্ষে বিদেশ হয়ে যাবে?

খবরটা অবশ্য আরো বেশী ভাল করেই পেয়েছিলাম যখন যে বিমান-বাহিনীর সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ রাখতে হয় তাদের সব লোককেই মত জানাতে হল যে তারা ইণ্ডিয়ার জন্য চাকরি করবে অথবা ইণ্ডিয়ার বাকী অংশের জন্য। সমস্তটাই একটা ভেল্‌কি বলে মনে হয়েছিল। ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট ঘোষ এসে যখন জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, এখন করুম কি?' তখন শুধু বলেছিলাম, 'ভায়া, ওটা কোন কাজের কথা নয়। ও দেশবিভাগ শুধু কাগজেই হয়ে রইল।'

কিন্তু তখনো বুঝিনি। তার আগেই নোয়াখালি, কলকাতা প্রভৃতি জায়গার ঘটনাগুলি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বুঝিনি। আশা ছিল যুদ্ধের মধ্যে মনুষ্যত্ব যদিও লোপাট হয়ে গেছে, যুদ্ধের পর আবার ক্রমে ক্রমে তা ফিরে আসবে। ভেবেছিলাম যে, স্বাধীনতা ক্ষমতার

সঙ্গে এনে দেবে দায়িত্ব, আর তারই চাপে দুই ভাগ দেশ কাগজে কলমে এক না হলেও মনে প্রাণে এক হয়েই চলবে। ভাইয়ে ভাইয়ে কি সত্যি সত্যিই তফাত হতে পারে?

রোম থেকে রমনা কত হাজার মাইল দূরে?

অতদূর থেকে এ ছাড়া আর কি-ই বা ভাবতে পারতাম? ঘরের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে যতই মারামারি হোক, বাইরে গিয়ে ভাই ভাই এক হয়ে দাঁড়ানই স্বাভাবিক। এই রোমে কেই বা আমাকে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান বলে মনে করে? সকলের চোখেই ত আমি শুধু ইণ্ডিয়ান। আর কিছু নয়। আমেরিকায় ত এতদিন সব ভারতীয়কেই হিন্দু বলে ডাকত। সে পরিচয়ে যে গৌরব ছিল, যে সম্মান ছিল, ইণ্ডিয়ান বললে তার অনেকখানি খোয়া যেত। তাই বিদেশে যেখানে রমন ও রহমনকে আমারই মত একেবারে নিজের দেশের লোক ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবতে পারিনি সেখানে রমনাকে, আমার জন্মের শৈশবের ও কৈশোরের রমনাকে কি করে বিদেশ বলে আজ মনে করব? অথবা রমনার ছেলে বলে কি করে বাকী দেশটাকেই বা বিদেশ বলে মনে করব আজ?

নাটক নভেলে পড়েছি হৃদয় ও কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব হয়। কেমন করে নাটকীয় ভাবে সে সমস্যার সমাধান করা যায় তার কথাও লেখা আছে। কিন্তু হৃদয়ের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের যেখানে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে সেখানে কি করব? এ কোন্ মহানাটক, যাতে এই নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল?

যে বিমান-বাহিনীর সঙ্গে আমি লেয়াইজঁ অর্থাৎ যোগাযোগ রক্ষা করার কাজে এসেছি, তার মধ্যে এমন কোন লোক নেই যে আমায় সমস্তটা ব্যাপার ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে। বরং দেখেছি যে আমি যেটুকু মনে মনে ধরে নিতে পারি, তারা তাও পারে না।

কাজেই আমার মনে যে চিন্তা দোলা দিয়ে যায় তার উপরের ঢেউটুকুও ওরা বুঝতে পারে না। দূর, সুদূর আমার দেশে যেখানে এই মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে সেখানকার পাত্র-পাত্রীরা না জানি কতটুকু বুঝতে পারছে।

তা, যাক সে কথা। কিন্তু যে জিনিসটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে সেটাকে স্বাভাবিক বলে প্রমাণও কেউ করছে না। আমার চারপাশেই দেখেছি যুদ্ধের হানাহানি ও যুদ্ধের পরের হাহাকার। কিন্তু আমার দেশে কি এসেছিল যুদ্ধ তার মরণ, মারামারি ও মহামারী নিয়ে? যুদ্ধের জন্য যে দুর্ভিক্ষ এসেছিল তাতে ত মানুষ সবাই একই মরণের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। তবে, তবে কেন আমি নিজের দেশে বিদেশী হয়ে গেলাম? কেন এত দুঃখ-দুর্দশা নির্ভরসা নির্বাসনের মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে আমার রমনার চেয়ে অনেক লোক, অনেক আত্মীয়?

যাক সে কথা। রমনা অনেক দূরের কথা। তার দুরবস্থার ছবি এমন আর বেশী কি? আজ এই রোমে যা দেখছি তার চেয়ে বেশী কি? এ কথা ভেবেই নিজেকে ভুলিয়ে রাখি।

আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নিজেকেও আমেরিকান যুদ্ধের যন্ত্রের একটা অংশ বলে মনে করতে আরম্ভ করেছিলাম। সেই মনে করার ফলেই অতিমানবের রোমে অতি আধুনিক চিন্তা বার বার মনে এসেছে। ফোরামের (Forum) ধ্বংসস্তূপ দেখে মনে হয়েছে যে, এ কি পুরোনো জঞ্জালের রাশি? এই সব ভাঙ্গা ইট-পাথর সরিয়ে ফেলে ঝকঝকে একটা নতুন শৌখিন বাগান করে দেওয়া উচিত। আর এই সব গরীব ছেলে-মেয়ে যারা এই 'ফোরামে'র কাছেই প্যালাটাইন পাহাড়ে সীজারদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপগুলিতে বেড়াতে আসে তাদের এখানে মানায় না। এখানে শুধু তাদেরই আসা উচিত

যারা ঝকঝকে পোশাক আর চকচকে আধুনিক মন নিয়ে তারিফ করতে করতে নানা ভঙ্গিতে নানা কোণ থেকে ছবি নিয়ে যেতে পারবে। নিজেদের মনে নয়, ক্যামেরার চোখে।

এমন সময় হঠাৎ কি হল জানি না। এটা অবশ্য জানতাম যে, এসব জায়গায় সন্ধ্যাবেলা আসা আজকাল মেয়েদের পক্ষে নিরাপদ নয়। যুদ্ধ যখনি যে পথ দিয়ে গিয়েছে মানুষকে করেছে পশু বা পশুর অধম। নারীকে করেছে পশুর চেয়ে অসহায়। যুদ্ধের আগুন যে দেশকে পুড়িয়েছে সে দেশের যুদ্ধের পরের দুরবস্থা যে কতখানি হয়েছে তা আমাদের দেশে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর কোন দেশেই ভুক্তভোগী না হলে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। যে সব দেশে সত্যি সত্যি লড়াই হয়ে যায় তার বর্ণনা দিতে যাওয়া বৃথা। এই ত রোমের চারপাশের গ্রামগুলি দেখছি—ভাঙাচোরা, আর গোলার শূন্য 'শেল' ছাড়া আর ত কিছুই দেখা যায় না। হ্যাঁ, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে বইকি। তবু মেয়েরা কত ভয়ে ভয়ে আনা-গোনা করছে। ছেলেরা পুরোনো 'কামোফ্লাজ' করা কামানগুলির উপর চড়ে খেলা করছে। কয়েকজন বাড়ীর দেয়ালগুলির হাজারো ফাটলের ভিতর দিয়ে লুকোচুরি খেলা করছে। তারি মধ্যে বোমায় ধ্বংস করা একটা ভাঁড়ারঘরে পচে-যাওয়া এক টুকরো রুটি দেখতে পেল। তার ভিতর থেকে একটুখানি খাবার মত টুকরো যদি পাওয়া যায় তার চেষ্টায় রুটিটা ছিঁড়ে ফেলছে। একটা বাড়ীর সামনের সবটা ভেঙে উড়ে গেছে, শুধু সিঁড়িটা ভাঙা শঙ্খের ভিতরের শিরদাঁড়াটার মত দেখা যাচ্ছে।

শঙ্খ? শঙ্খের কথায় মনে হল রমনাকে। সেখানে কি এখনো শঙ্খ বাজে সন্ধ্যাবেলা?

মুছে যাক রমনা মন থেকে। কত হাজার মাইল দূর আমার সে দেশ রোম থেকে? তার হিসাব ত ভূগোলে পাওয়া যাবে না।

এই ত আমার পাশ দিয়ে একটা ভাঙা ঝরঝরে 'বাস' গাড়ী চলে গেল। তাতে বোঝাই হয়ে যাচ্ছে একদল ভিখারী। অতিমানবের দেশের রাজধানীতে ভিখারী? হ্যাঁ, ঠিক তাই। সকালবেলা ওরা দল বেঁধে এসেছিল পেটের দায়ে। যাদের কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে বা না-খেয়ে-খেয়ে নানা রোগের আক্রমণে অথর্ব হয়ে গেছে, তারা এই জীবন ধারণ করবার চেষ্টা করছে। অথচ এদের সকলেরই ঘরে ছিল খাবার, ছিল নিজে খেটে নিজের উপায়ে বাঁচবার পথ। এরা ভিখারী ছিল না কেউ। ভিক্ষা করে জীবন বাঁচাতে হবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। অথচ আজ দল বেঁধে 'বাসে' করে এসে শহরে ভিক্ষা করতে শুরু করেছে। একটা গোটা পরিবার গান-বাজনা করে ভিক্ষা করছে। বাপ চলেছে 'একর্‌ডিয়ান' নিয়ে; সাতটি ছেলেমেয়ে 'সাক্‌সোফোনের' মত নানা রকম বাজনা নিয়ে ঐক্যতান বাদন করতে করতে চলেছে। মা শুধু তাল রাখছে, কারণ তার কোলে রয়েছে একটি বিবর্ণ বুভুক্ষু শিশু। দুধ কি ছাই মায়ের বুকে আর আছে কিছু? কিন্তু কি গানের সুরটা এরা বাজাচ্ছে তা মন দিয়ে শুনতে গিয়ে চম্‌কিয়ে উঠলাম। এ ত ইটালির শ্রেষ্ঠ গায়ক 'ক্যারুসো'র গাওয়া গান। যারা এ গান গেয়ে বেড়াচ্ছে তারা ত ভিখারী নয়। রবীন্দ্রনাথের 'গোপন স্বপনচারিণী' যে গায় সে ত অশিক্ষিত পথের ভিখারী নয়। তবে?

রবীন্দ্রনাথের গানের কথা মনকে একটা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। রোমের রাস্তায় ক্যারুসোর গান গেয়ে ভিক্ষা করছে এরা। রমনায় যারা সকালবেলা শিউলি ফুলের রাশি ঘরে জড়ো করে রেখে নিজেরা সুরভিত শেফালীর মত হাসিমুখে "শেফালী তোমার আঁচলখানি" গাইত—তারা এখন কি করছে?

যেতে দাও, যেতে দাও ও-সব হাজার হাজার মাইল দূরের হাজার

স্মৃতি। আমি, প্রবাসী এক বাঙালী মিলিটারী পোশাক এঁটে বিমান-বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। আমার ওই টলটলে জলভরা ঝলমল আলোয় উজ্জ্বল দূর কোন দেশের, বহুদিন পেছনে ফেলে আসা দূর একটা দেশের অত শত স্মৃতিতে কাজ কি?

আলোয় উজ্জ্বল স্মৃতিকে ছেয়ে মুছে দিল কালো বাজারের কথা! ছোট ছোট ছেলেদের এখানে বলে 'র‍্যাগাৎসিনি'। সবাই কালো বাজারের দালাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরাই সে বাজারের সঙ্গে চালাচ্ছে যোগাযোগ। একটু অসাবধানে তাদের দিকে তাকালেই চট্ করে একজন এসে একটা অশ্লীল ব্যাপারের খোঁজ দেবে। তাদের কাছে আমার সামরিক পোশাকের মানে হচ্ছে অফুরন্ত সিগারেট। সিগারেট হচ্ছে এখানে লেনদেনের সবচেয়ে বড় টাকা। যারা স্কুলে লেখাপড়া শিখত, মানুষ হবার স্বপ্ন দেখত, বাপ-মায়ের আশা ছিল—তারা এখন সৈন্যদের কাছ থেকে আড়াইশো 'লিরা' অর্থাৎ প্রায় দশ টাকায় এক প্যাকেট সিগারেট বা সামান্য কিছু খাবার বা পরবার জিনিস কিনে বাড়ীতে গিয়ে বাপকে দেবে। বাপ তখন অন্য জায়গায় আরো চড়া দামে সেগুলি বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। সেদিন আমার চোখের সামনে একজন সাদা সৈন্য একটি নিগ্রোকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে বার শ লিরাতে তাকে একপাল 'র‍্যাগাৎসিনি'র কাছে বিক্রি করে দিল। ছোকরারা চটপট তার কাপড় চোপড় ছাড়িয়ে নিয়ে সব কিছু বিক্রি করে কয়েক হাজার লিরা লাভ করে নিয়েছিল বলে শোনা গেছে। এরাই ছিল একদিন পড়ুয়া ছেলে।

পড়ুয়া কথাটা চড়চড় করে নাড়া দিয়ে উঠল মনে। আমাদের দেশের গ্রাম থেকে যারা সকালবেলা পান্তা ভাত খেয়ে হৈ-হৈ করতে করতে পাঠশালায় যেত, তারা এখন কি করছে? তারাও কি বাপ-মায়ের অসহায় অবস্থা দেখে এখন পড়া ছেড়ে পাঁড় কালোবাজারী হয়ে

গেছে ? আজ যে চিঠি পেয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই যে ওই ফুলের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেকেই আর ফুলের মত নেই। দুর্ভাগ্য তাদের অনেককেই অকালে ম্লান করে দিয়েছে, ঝরিয়ে দিচ্ছে। বেঁচে থাকাই যাদের দায় হয়ে উঠল, কি হবে তাদের শিক্ষা আর কৃষ্টি দিয়ে ? জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা—বেঁচে থাকতে পারা।

আমায় ত কেউই চিঠি লেখে না। আছেই বা কে বাকী আমার সংসারে ? ১৯৪৩-এর অকালের মন্বন্তরে গ্রাম উজাড় করে সবাই ভিখারী হয়ে যাচ্ছে দেখে সেই যে দেশ ছেড়ে যুদ্ধের কাজ নিয়ে বিদেশে চলে এসেছি, তারপর থেকে চিঠি বা অন্যান্য খবর পাওয়াও প্রায় বন্ধ। আমি আনকোরা 'লেয়াইজন' (Liaison) অফিসার বটে, কিন্তু আপন লোকজন কেহ না থাকায় আমার সঙ্গে আমার দেশের যোগাযোগ খুব সামান্যই ছিল। তবু আজ একটা চিঠি পেলাম—সেই প্রায় ভুলে যাওয়া, স্বপ্নে দেখা রমনা থেকে। আর সে চিঠিটা কোথায় বসে পড়লাম ? সে কথা ভাবলেও হাসি পায় এখন।

প্রায় দু শ বছর আগে কাফে গ্রেকো (Cafe Greco) প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশ থেকে শিল্প ও সাহিত্যরসিক যে-ই না কেন রোমে আসে, কাফে গ্রেকোতে তাকে একবার যেতেই হবে। দু শ বছর ধরে এখানে এসে আড্ডা জমিয়েছেন রোমে প্রবাসী ইয়োরোপীয় শ্রেষ্ঠ মনীষীরা। তাঁদের লেখাপড়া, স্ফূর্তি, বিশ্রাম অনেক কিছুই হয়েছে এই কাফেতে। যুদ্ধে রোমের জীবন ওলট-পালট হয়ে গেলেও যুদ্ধের পর এই কাফের জীবন আমেরিকানদের দৌলতে আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। রঙীন রশির তৈরী পরদা ঠেলে প্রায় অন্ধকার ছোট ছোট ঘরগুলির মধ্যে একটিতে বসে দেওয়ালে টাঙানো বিখ্যাত অতীতের অতিথিদের ছবিগুলি দেখতে দেখতে কফি খাচ্ছিলাম। ওয়েটার আমায় একটি একটি করে পুরোনো নাম-সইয়ের অ্যালবাম-

গুলি দেখাচ্ছিল। বর্তমানের ধ্বংস অবস্থা সত্ত্বেও পুরোনো যুগের সঙ্গে এই পারিপার্শ্বিক চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল। ওয়েটারের পুরোনো আমলের জমকালো পোশাকটাও এই ঐতিহাসিক কাফের সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। শুধু খাপ খায়নি বায়রন, শেলী, কীট্‌স, হ্বাগ্‌নার, আনাতোল ফান্স, গ্যেটে, গোগল প্রভৃতি পৃথিবী-জোড়া নামী লোকদের তালিকার সঙ্গে আমার দেশ থেকে পাওয়া পাড়াপড়শী আর বন্ধুদের নামের তালিকা। শোপনহাওয়েরের নামটা পড়তে পড়তে স্বপ্নার কথাটা নিজেরই অজ্ঞাতসারে মনের কোণায় জেগে উঠেছিল। তখনো পকেট থেকে চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করিনি। সে টেবিলেই আরো একজন লোক বসে ছিল। তার বিদায়ের পর নিরিবিলি বসে দেশের খবর উপভোগ করব বলে বসেছিলাম। জানতাম না যে, স্বপ্নার খবরও তাতে এমন ভাবে পাব। শোপনহাওয়ের থেকে স্বপ্না, আমার কৈশোর স্বপ্নের স্বপ্না—হ্যাঁ, অনেক দূর বইকি। রোম থেকে রমনা যতখানি, তার চেয়েও অনেক বেশী।

কতখানি তা এই চিঠিটাই আমায় বুঝিয়ে দিল।

তারপর সেই অসহায় অপরাহ্নে সমস্ত কোলাহল আর সৈন্য-বাহিনীর আনাগোনায় অস্থির রোম আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কোথা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বর্তমানের ভগ্নস্তূপের হাহাকার সইতে না পেরে অতীতের ভগ্নস্তূপ 'ফোরামে' এসে বসেছিলাম জানি না। কোথা দিয়ে সীজারের স্তম্ভের পাশ দিয়ে, কলিসিয়ামের (Coliseum) কোণ ঘেঁষে সূর্য অস্ত গেল জানি না। আস্তে আস্তে অন্ধকারে গা ঢেকে বিজয়ী পক্ষের টহলদারী সৈন্যরা এখানে ওখানে দেহপসারিনীদের সঙ্গে আলাপ ও দরকষাকষি আরম্ভ করল। 'পোভেরা ইটালিয়া' (Povera Italia) দরিদ্রা ইটালি চিরকালের এই অজুহাত ত

আছেই। কিন্তু এখন যুদ্ধের পরের নিদারুণ অবস্থার চাপে রাতের অন্ধকারে পৃথিবীর প্রথম পাপ নিজেকে খুলে ধরল। আরো অসহ্য হয়ে উঠল সব। তাই নির্জন জায়গায় সরে এলাম। কিন্তু পাপের ইশারার হাত থেকে রেহাই কই?

হঠাৎ একটা করুণ আর্তনাদে কোথা থেকে কি যেন ওলট পালট হয়ে গেল। ছুটে গেলাম। পাগলের মত সেই আর্তনাদের দিকে ছুটে গেলাম। সৃষ্টির আদিম প্রবৃত্তির হাত থেকে একটি মেয়েকে বাঁচাবার জন্য। মানুষের মধ্যে যে জানোয়ার আছে তার দলবেঁধে পাইকারী অত্যাচার থেকে একটি মেয়েকে বাঁচাবার জন্য। পেছনে পড়ে রইল বাঙালী-জীবনের সমস্ত হিসাব কষে সাবধানে চলা, নিজের গা বাঁচিয়ে কোন রকমে টিঁকে থাকা।

তারপর সেই রাত্রিবেলা রক্তমাখা জখম শরীরে, ছেঁড়া কাপড়ে, পায়ে হেঁটে মিলিটারী পুলিসে ঘেরাও হয়ে চলেছি ব্যারাকের দিকে। ঢপ্ ঢপ্ ঢপ্ ভারী মিলিটারী বুটের আওয়াজে রোমের সাম্রাজ্যের স্মরণে তৈরী রাজপথ 'ভিয়া দেল ইম্পেরা' কেঁদে ককিয়ে উঠছে। আর তার সঙ্গে সহানুভূতিতে নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি করছে আমার অসহায় বিচারবুদ্ধি। ওই অত্যাচারী দলের সকলে একসঙ্গে নালিশ লিখিয়েছে যে, আমি লেয়াইজন অফিসার ক্যাপ্টেন ধর একটি বড়ঘরের অনিচ্ছুক ইটালিয়ান মেয়েকে একা পেয়ে অত্যাচার করতে যাচ্ছিলাম। আর ওরা দল বেঁধে ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখে ব্যারাকে ফিরে যাবার সময় তার চীৎকার শুনে এগিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে। আমি এত বেশী মরিয়া হয়ে তাদের বাধা দিয়েছি যে তাদের পক্ষে মারধোর ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। তা না হলে ক্যাপ্টেন্ ধরের গায়ে হাত চালান তাদের পক্ষে কল্পনারও অতীত।

কল্পনারও অতীত? ঠিক তাই ত।— আমার রমনার স্বপ্না।

কবিতার মত, ফুলের মত স্বপ্না। পৃথিবীর সমস্ত রস নিংড়ে শুধু বাংলা-দেশের হৃদয়েই এমন তিলোত্তমারা গড়ে ওঠে। সেই স্বপ্নার কিনা নিজের ঘরে, নিজের দেশে ঠাঁই হল না? দেশটা গেল ভাগ হয়ে। ভবিষ্যতে কি হবে তার ঠিক নেই বলে ভয়ে ভয়ে ওরা সবাই চলে গেল নিজেদের ভিটে ছেড়ে। কোথায় গেল, কি হল কেউ জানে না। শুধু এটুকু খবর এসেছে যে কোন্ অজানা জায়গায় নির্জন পদ্মপুকুরের পারে লোকে স্বপ্নার একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিল। আর কিছুই না, কিছুই না। এ-ধারে বুড়ীগঙ্গা, ও-ধারে গঙ্গা—কোথাও যারা নিশ্চিন্তে মাথা গুঁজতে পারল না, তাদের গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে আসবে কে? কারই বা এত মাথাব্যথা?

সে স্বপ্নার কি হল কেউ জানে না, জানবার কোন চেষ্টা কেউ করছে কিনা সে সম্বন্ধে সে চিঠিতে একটু আভাসও নেই। সেটা বোধ হয় আমাদের সমাজে বা দেশে এমন কোন দরকারী ব্যাপার নয়। তা হোক। পরাজিত, যুদ্ধে লণ্ডভণ্ড ইটালির একটি স্বপ্না আজ এই শহরের বাইরে নির্জন জায়গায় রক্ষা পেয়ে গিয়েছে! কিন্তু যুদ্ধের বহু দূরে বাংলার এক নিরালা কোণার অসহায় মেয়ে স্বপ্না রক্ষা পেল না! তার কি হয়েছে তা জানি না।

আমার কি হবে তাও আমি জানতে চাই না।

এই ঝকঝকে ইউনিফর্ম ও তার তিনটি স্টার-চিহ্ন, এই দূর বিদেশে বহু চেষ্টায় যোগাড় করা মিলিটারী কাজ, এই হার-মানা রোমের বুকের উপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে আসা-যাওয়া সবই হয়ত কোর্ট-মার্শালে শেষ হয়ে যাবে। হিসাব করে দেখতে গেলে বুঝতে পারব না কার জন্য, কোন্ বিদেশে কোন্ বিদেশিনীর জন্য এই ক্ষতি, এই ত্যাগ। কিন্তু আমার রমনার সেই স্বপ্না? সে ত আমার কাছে শুধু একটি স্মৃতি-সৌরভে জড়ান বাঙালী মেয়ে। শুধু পাড়ার মেয়ে। শুধু আমারই

মতন দলাদলি, রাজনীতি প্রভৃতি থেকে দূরে থাকা সাধারণ একটি অসহায়া কিশোরী। আমার প্রতিবেশী আমার বঙ্গবাসী সবাই ত অসহায়। কিন্তু কে আমি? তুচ্ছের চেয়ে তুচ্ছ আমি? কে আমি যে, গোটা পৃথিবীর স্বপ্নাদের কথা ভাবতে যাব? তাদের জন্য সংসারের লোকসান আর লোকলজ্জার মধ্যে পড়তে যাব?

একটি বাগানের মধ্য দিয়ে আমি, বন্দী ক্যাপ্টেন ধর, মিলিটারী পুলিসে ঘেরাও হয়ে চলেছি। ছোট্ট একটি 'লিলি-পণ্ড'—পদ্মপুকুরের পাড়ের কাছে কয়েকটি হলদে লিলি চাঁদের আলোয় হাসছে। ওদের বললাম যে আমি এখানে জলের পাড়ে একটু দাঁড়াতে চাই। স্যালুট করে তারা আমায় ছেড়ে দিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে রইল। একটু ইতস্ততঃ করে তিন-চারটে লিলি হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম। মৃণালগুলিকে সূতোর মত বেঁধে লিলির মালা গেঁথে নিলাম। তারপর কি ভেবে সেগুলি জলেই ভাসিয়ে দিয়ে পুলিসের কাছে ফিরে এলাম। তারা বুঝতে না পেরে আমার দিকে তাকাল শুধু।

টপ্ টপ্ টপ্। মিলিটারী বুটের ভারী আওয়াজের আর শেষ নেই। তার প্রতিধ্বনি কি রোম থেকে রমনা এসে পৌঁছাল?